দ্বিতীয় অধ্যায়
সিলেট শহরের সার্বিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াসসমূহ

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি

সুদূর অতীতে সিলেট "শ্রীহট্ট" বা "হরিকেল" নামক একটি আলাদা রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। এই রাজ্যটি দশম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের শাসনামলে একটি প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামন্ত রাজদের দ্বারা শাসিত ছিল। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সিলেট শহরটি "লাউর", "গাউর" এবং "জৈন্তা" রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই সময়েই এলাকাটিতে লোকবসতি ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে। সিলেট মুসলিম সুলতানদের অধীনে আসে ১৩০৩ শতকে, হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর সিলেট বিজয়ের মাধ্যমে। ১৬১২ সালে এলাকাটি মুঘল সম্রাজ্যের অধীনে আসে। ১৮৭৪ সালে ভিন্নতর ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সিলেট অঞ্চলকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এতে সিলেটের গুরুত্ব বেড়ে গেলেও স্থানীয় লোকজন এর বিরোধিতা করে। ১৯৪৭ সালে জনগণের ভোটের মাধ্যমেই সিলেট আবার পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে সিলেট ঢাকা বিভাগের অধীনে শাসিত হতো। কিন্তু ১৮৭৪ সালে সিলেট এবং প্রতিবেশী কাছার জেলা নবগঠিত আসাম প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। ১৮৬৭ সালে সিলেট জেলাকে ৪টি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো- সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ । সিলেট সদর আবার ১৮৮২ সালে উত্তর উপ-বিভাগ এবং দক্ষিণ উপ-বিভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নামে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়, তাতে সিলেট অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ায় সিলেট পুনরায় আসামের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে সিলেট শহরটি বৃহত্তর সিলেট জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অতীতে সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির সাথে আসাম, কলকাতা এমনকি পাটনার ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল যা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬১ সালের মধ্যে সিলেট আবার নতুন অবস্থানে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়।

১৮৭৬ সালের মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট অনুসারে, ১৮৭৮ সালে সিলেট মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অ্যাক্ত মোতাবেক সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা নির্ধারণ করা হয় উত্তরে আম্বরখানা রোড, দক্ষিণে সুরমা নদী, পূর্বে গোয়ালীছড়া এবং পশ্চিমে সাগর দীঘির পাড় ও উজানলেন।

১৯৯৬ সালে সিলেট বিভাগীয় সদর দপ্তরে রূপান্তরিত হয় এবং ২০০২ সালে এটিকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২৬.৫ বর্গ কিঃ মিঃ এবং জনসংখ্যা ২,৬২,৮৯৯ (বিবিএসঃ ২০০১)। অতি সম্প্রতি সিলেটকে মেট্রোপলিটান এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যার অধীনে ছয়টি থানা অন্তর্ভূক্ত। থানাগুলো হলো কোতোয়ালী, দক্ষিণ সুরমা, মোগলাবাজার, শাহ পরান, এয়ারপোর্ট এবং জালালাবাদ।

২.২ জনসংখ্যা পরিবর্তন

১৮৭২ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী সিলেট শহরের জনসংখ্যা ছিল ১৬,৮৪৬। ১৯৬১-১৯৮১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ১৫২%। ১৯৭১ সাল থেকে মিউনিসিপ্যাল এলাকার আসল বিস্তার শুরু হয়। স্বাধীনতার পর মানুষের গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের প্রবণতা বেড়ে যায়, যার কারণে সমগ্র দেশেই শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা তীব্র গতিতে বাড়তে থাকে। ১৯৮৪ সালে সিলেট মিউনিসিপ্যাল এলাকার আয়তন ৫.৮২ বর্গ কিঃ মিঃ থেকে বেড়ে ১০.৪৯ বর্গ কিঃ মিঃ এ দাঁড়ায়।

১৯৯১ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত সিলেট এলাকায় ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একটিকে আলাদা বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সময়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ (১৭২.৮%) যা অন্য ১৭টি পৌরসভার (যাদের জনসংখ্যা ১ লক্ষের বেশি) মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এই অবস্থার আরও একটি কারণ ছিল বিদেশে কর্মরত সিলেটীদের অধিক হারে রেমিট্যান্স প্রেরণ, যা এই এলাকার লোকজনকে শহরে বসবাস করার সামর্থ্য

এনে দেয় এবং গ্রামের সুযোগ সুবিধাহীন জীবন থেকে শহরে চলে আসতে উৎসাহিত করে। ২০০১ সালে সিলেট সদর উপজেলার প্রায় ৭২.৯৫% লোক নগর এলাকায় বাস করত।

২.৩ পরিকল্পনা এলাকার ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ

২.৩.১ পরিকল্পনা এলাকার জিও-ফিজিক্যাল অবস্থা

সিলেট জেলায় বিভিন্ন ধরনের মাটি দেখতে পওয়া যায়। বেশির ভাগ অঞ্চলে মাটি অম্ল প্রকৃতির। কিন্তু দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বন্যার পানিতে প্লাবিত হলে উপরিভাগের মাটি প্রায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকে। বিভিন্ন এলাকায় ধূসর বা গাঢ় ধূসর রঙের, প্রধানতঃ কালা এবং প্রায় ২ ফুট পুরু স্তর দেখা যায়। উপরিভাগে কিছু কাদা বা বালির স্তর আছে।

ক. জলবায়ু

সিলেট শহরে প্রধানত গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ু বিরাজ করে। তবে এর সাথে ভারী বৃষ্টিপাতও হয়, যা দেশের বাকি অংশের জলবায়ুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে (মার্চ-মে) গড় মাপমাত্রা থাকে ২৬.৬° সে. যা শীতকালে ১৯.৭° সে. এ নেমে আসে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৮৮০ মিঃ মিঃ। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় জুন-জুলাই মাসে। যদিও দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় বৃষ্টিপাত অনেক বেশি তবুও বলা যায় সিলেটের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য দেশের অন্যান্য অংশের মতই।

খ. টপোগ্রাফি, প্রাকৃতিক ড্রেনেজ এবং ভূতাত্ত্বিক ত্রুটি

সিলেট শহরের টপোগ্রাফি বেশ উঁচুনিচু। গড় উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে + ১.২৩৩ মিঃ থেকে + ৪,২২১ মিঃ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূমির গড় উচ্চতা + ১৮.৮৫৬ মিঃ (গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে)। টপোগ্রাফিক সার্ভে থেকে দেখা যায় যে প্রায় ৩৫.৭৬% এলাকার গড় উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে + ১০.০০১ মিঃ এবং +১৫.০০০ মি. এর মাঝে। শহরের উত্তরদিকে কিছু বিচ্ছিন্ন টিলা ছাড়া পুরো শহরটির টপোগ্রাফি মোটামুটি একই ধরনের সমতল। সবচেয়ে নিচু এলাকা পাওয়া যায় টুলটিকর ইউনিয়নে যার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫.০০ মিঃ। সর্বোচ্চ হচ্ছে টুকের বাজার ইউনিয়নে। কন্টুর (contour) লেভেলের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, পুরো শহরে কুচাই ইউনিয়নটি তুলনামূলকভাবে নিচু এবং টুকের বাজার ইউনিয়ন তুলনামূলকভাবে উঁচু। স্পট লেভেল (spot level) সার্ভে থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের বিভিন্ন এলাকা যেমন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, খাদিমনগর এবং কুচাই ইউনিয়ন ইত্যাদির উচ্চতা তুলনামূলকভাবে কম এবং উত্তর পূর্বদিকের এলাকা যেমন, টুকেরবাজার ইউনিয়নের উচ্চতা সমগ্র প্রকল্প এলাকার গড় উচ্চতা হতে বেশি।

সুরমা-কুশিয়ারা নদী এবং তাদের বিভিন্ন শাখা ও উপনদী সমূহ জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং শহরটির বিস্তার ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বর্তমানে শহরের উন্নয়নে নদীগুলোর ভূমিকা কমে গেছে। এর প্রধান কারণ বোরাক এবং সুরমা নদীর মোহোনায় পলির আস্তরণ। শহরের পানির চাহিদা পূরণ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য এই নদীগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুরমা নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ছড়াগুলো অবৈধ দখলের কারণে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। শহরটিতে অনেকগুলো পুকুর, দীঘি এবং দূষিত ডোবা আছে। এগুলো বর্ষার পানি ধরে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সিলেট শহরের পূর্বাংশেই ডাউকি ফল্ট এর অবস্থান। এছাড়া কাছাকাছি রয়েছে সুগভীর সিলেট ফল্ট। ঝুঁকিপূর্ণ আসাম, জাফলং থ্রাস্ট, নাগা থ্রাস্ট এবং ডিসাং থ্রাস্টের কারণে সিলেট শহরটি উচ্চ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। সিলেট বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা-৩ এ অবস্থিত। গত ১৫০ বছরের মধ্যে সিলেটে ৭.৫ মাত্রার বেশি তিনটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ম্যাপ-২.১ এ সিলেট শহর ও তার আশেপাশের ফল্ট লাইনগুলো দেখানো হয়েছে।

Map-2.1 Location of Seismic Fault Line of Sylhet Region in Context of Bangladesh

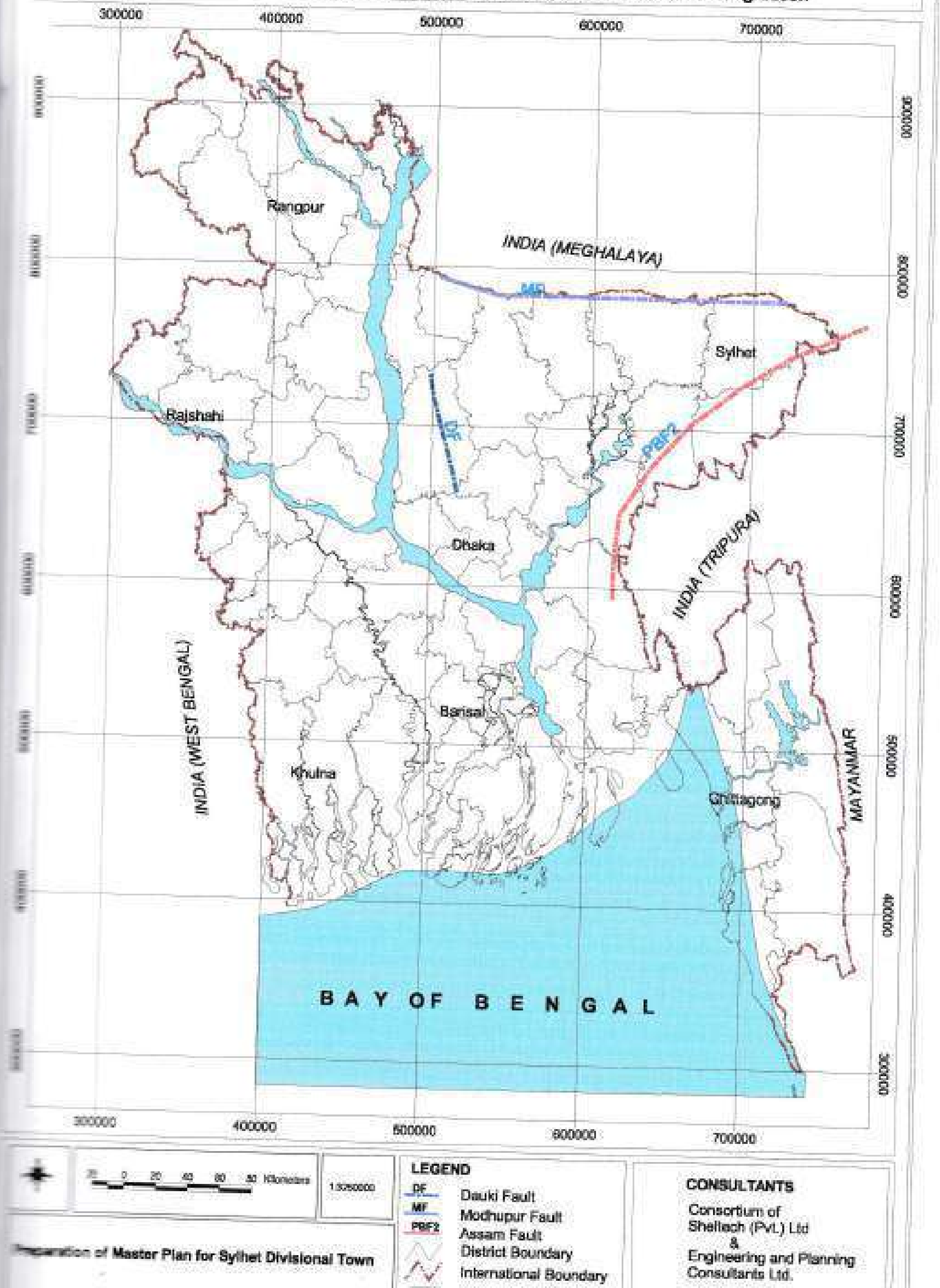

২.৩.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকায় ভূমি ব্যবহার

ভবন বা জায়গা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ভূমি ব্যবহার জরিপের মাধ্যমে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জরিপকৃত তথ্যাবলী থেকে অবস্থান অনুযায়ী ভূমি ব্যবহারের তালিকা তৈরী করা হয়েছে, যেমন, আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক ইত্যাদি। প্রতিটি ভূমির ব্যবহারকে এক একটি আইডি বা কোড দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। তথ্য বিন্যাসের সময় আলাদা স্তরে (layer) ভূমির ব্যবহারের তথ্যাবলী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই তথ্যাবলী থেকে শ্রেণী অনুযায়ী কম্পিউটারের জিআইএস সফটওয়ারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এরপর ইউনিয়ন অনুযায়ী ভূমির ব্যবহার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। টার্মস অব রেফারেন্সের নির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র শহরের ভূমির ব্যবহারকে ২৫টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। **সারণি-২.১** এবং **ম্যাপ-২.২** এ পরিকল্পনা এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-২.১: প্রকল্প এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার শ্রেণী	আয়তন (একর)	আয়তন (হেক্টর)	%
আবাসিক	৪৮৩৮.৫৩	১৯৫৬.৪৭	২২.৯৮
কৃষিজমি	৪৫২৩.৫২	১৮৩১.৪২	২১.৫০
চা বাগান	৩৭৩৯.৬০	১৫১৩.৩৭	১৭.৭৭
অব্যবহৃত ভূমি	১৬৪৫.৮৫	৬৬৬.০৬	৭.৮২
গ্রামীণ বসতি	১৪০৮.৬৫	৫৭০.০৬	৬.৭০
জলাধার	১৩৫৬.৩৩	৫৪৮.৮৯	৬.৪৫
পরিবহন ও যোগাযোগ	৭১০.৪৩	২৮৭.৫০	৩.৩৮
টিলা এবং পাহাড়ী এলাকা	৬৪৭.২২	২৬১.৯২	৩.০৮
শিক্ষা ও গবেষণা	৫৪৭.১৫	২২১.৪২	২.৬০
বাস, ট্রাক ও লঞ্চ টার্মিনাল	৩৫৩.২৫	১৪২.৯৬	১.৬৮
বাণিজ্যিক	৩১৪.১৯	১২৭.১৫	১.৪৯
প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা	২৭৩.০১	১১০.৪৮	১.৩০
শিল্প/ প্রস্তুতকারক এবং প্রসেসিং	১৫৭.৪৪	৬৩.৭২	০.৭৫
প্রশাসনিক	১৩১.৯৪	৫৩.৪০	০.৬৩
উন্মুক্ত স্থান	১০২.৬৪	৪১.৫৪	০.৪৯
ধর্মীয় স্থান	৭৪.৮৮	৩০.৩০	০.৩৬
স্বাস্থ্য সুবিধা	৫৬.৫৩	২২.৮৮	০.২৭
কবরস্থান/ শ্মশান	৫৩.৮৫	২১.৭৯	০.২৭
মিশ্র ব্যবহার	৩০.৮২	১২.৪৭	০.১৫
অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবহার	২৯.৪০	১১.৯০	০.১৪
কমিউনিটি সেন্টার	৯.০৪	৩.৬৬	০.০৪
বস্তি এলাকা	৪.০৬	১.৬৪	০.০২
বিনোদন সুবিধাদি	১.৪৭	০.৫৯	০.০১
গুদাম / স্টোরেজ	১.৪০	০.৫৭	০.০১
অব্যবহৃত স্থান	০.২১	০.০৯	০.০০
ইউটিলিটি/ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস	০.১৩	০.০৫	০.০০
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র/ স্টেশন	০.০৫	০.০২	০.০০
মোট	**২১০৩৯.৭৩**	**৮৫১৫.৩২**	১০০.০০

উৎস: কনসালটেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত ভূমি ব্যবহার জরিপ, ২০০৭-২০০৮।

উপরোক্ত সারণী হতে এটি স্পষ্ট যে, সবচেয়ে বেশি পরিমান (২২.৯৮%) ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে আবাসিক এলাকা এবং গ্রামীণ বসতি হিসেবে। দ্বিতীয় প্রধান ব্যবহার হল কৃষি, যাতে প্রকল্প এলাকার ২১.৫০% ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। চা বাগানের আওতায় রয়েছে ১৭.৭৭% ভূমি। ৬.৪৫% জমি জলাধার হিসেবে এবং ৩.৩৮% জমি ব্যবহৃত হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে। প্রকল্প এলাকার শিক্ষা ও গবেষনা ক্ষেত্রে এবং বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যথাক্রমে ২.৬০% এবং ১.৪৯% ভূমি।

২.৩.৩ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আর্থ-সামাজিক জরিপের প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় সিলেট অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্য যে কোন শহরের তুলনায় অনেক বেশি সম্ভাবনাময়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল বিদেশ থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স। রেমিট্যান্সের সুবিধা গ্রহণ করে প্রকল্প এলাকায় ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ১২% পরিবার বিদেশ থেকে নিয়মিত রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে। প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যার ৮৪% মুসলিম। শহর এলাকায় ছোট পরিবার গঠনের ঝোঁক বেশি দেখা গেলেও পুরো প্রকল্প এলাকায় গড়ে প্রতিটি পরিবারে ৫.৫২ জন সদস্য রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাত ১০০:১২০ যা জাতীয় অনুপাত (১০০:১১৭) হতে সামান্য বেশী। এর প্রধান কারণ প্রকল্প এলাকা হতে পুরুষ জনসংখ্যা কাজের উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে যাওয়া। জরিপ থেকে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (৪৩%) বিদেশে বা দেশের অন্যান্য অংশে কর্মরত। শিক্ষিতের হার প্রায় ৯১% যা জাতীয় হার (৪৫%) এর তুলনায় অনেক বেশি।

জরিপকৃত লোকসংখ্যার প্রায় ৬৩% প্রতি মাসে ১০.০০০.০০ টাকা বা তার বেশি পরিমান আয় করে থাকে। অন্যদিকে দারিদ্র-সীমার (মাসিক আয় ৫৫০০ টাকার কম) নিচে বাস করছে মোট জরিপকৃতদের প্রায় ২৫.৬১% যা জাতীয় হার (২৮%) এর তুলনায় কম। জনসংখ্যার প্রায় ৬১% কর্মক্ষম বয়স সীমার অন্তর্ভূক্ত, যদিও মাত্র ৩৩% লোক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। জনসংখ্যার ৪০% নির্ভরশীল বয়স সীমার অন্তর্ভূক্ত।

২.৪ শহর সম্প্রসারণের গতিধারা

শহর সম্প্রসারণে প্রধানতঃ দুটি বিষয় সবচেয়ে বেশি কাজ করে, ভূমির উচ্চতা (বা বন্যা মুক্ত কি না) ও রাস্তার অবকাঠামো। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো, প্রয়োজনীয় স্থাপনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা, বাজার এবং বন্দর সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টার্মিনাল, বিনিয়োগের জন্য সম্পদের প্রবাহ ইত্যাদি। সিলেট শহরের সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধিতে উপরোক্ত বিষয়ের অনেকগুলোই অবদান রেখেছে। দেখা গেছে, শহরের সম্প্রসারণ হয়েছে প্রধানত উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে। দক্ষিণ দিকে সুরমা নদী প্রবাহিত। সুরমা নদীর উপর নির্মাণকৃত ৪টি সেতু শহরের দক্ষিণ অংশের সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে। যদিও এই দিকে বিসিক শিল্প নগরীর মত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে তবুও এই দিকে শহরের সম্প্রসারণ হয়েছে তুলনামূলক কম। এর কারণ প্রধানত দুটি, প্রথমত, বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক নাগরিক সুযোগ সুবিধার অভাব এবং সরকারী স্থাপনাসমূহ সুরমা নদীর অন্য পাড়ে প্রধান শহর এলাকায় অবস্থিত: দ্বিতীয় কারণ হল, দক্ষিণের অংশটি মূল অংশ হতে নিচু এবং এ কারণে বন্যাপ্রবন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। শহরের পূর্বাংশে ভূমি অপেক্ষাকৃত উঁচু (কিছু পকেট এলাকা বাদে)। এ অংশ দিয়ে আন্তঃ জেলা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। খাদিমপুরে আরও একটি বিসিক শিল্প নগরী অবস্থিত, যা এই এলাকার শিল্পায়নকে উৎসাহিত করছে। উত্তর পূর্বাংশে জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু তাই স্বাভাবিকভাবে প্রবৃদ্ধির ধারা এই এলাকাতেই বেশি। উত্তরদিকের টিলা এবং পাহাড়ি এলাকার কারণে শহরের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। এ এলাকায় চা বাগানগুলো অবস্থিত। তবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের পর এই এলাকার আশে পাশে উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই এলাকায় বেসরকারী উদ্যোগে কিছু গৃহায়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। পশ্চিমাংশে জমি আশেপাশের এলাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু (সিটি কর্পোরেশন এলাকা বাদে)। এই এলাকায় ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই এলাকায় একটি নতুন বাইপাস সড়ক নির্মিত হয়েছে যা শহরের সুরমা নদীর দক্ষিনের এলাকাকে সুনামগঞ্জ সড়ক ও ঢাকা সিলেট সড়কের সাথে সংযুক্ত করেছে। এ কারণে শহরের সম্প্রসারণ এ অংশে স্বাভাবিকভাবে বেশি হবে। শহরের এই অংশেই শহরের একমাত্র সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। শহরের অভ্যন্তরে প্রবাসী সিলেটীদের বিনিয়োগে প্রচুর হোটেল, শপিংমল এবং এপার্টমেন্ট নির্মিত হচ্ছে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে যা মাল্টিপ্লায়ার একেক্ট এর মাধ্যমে শহরের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করবে। ম্যাপ-২.৩ এ সিলেট শহরের সম্প্রসারণের ধারা দেখানো হয়েছে।

ap - 2.2

Existing Generalized Land Use of the Project Area

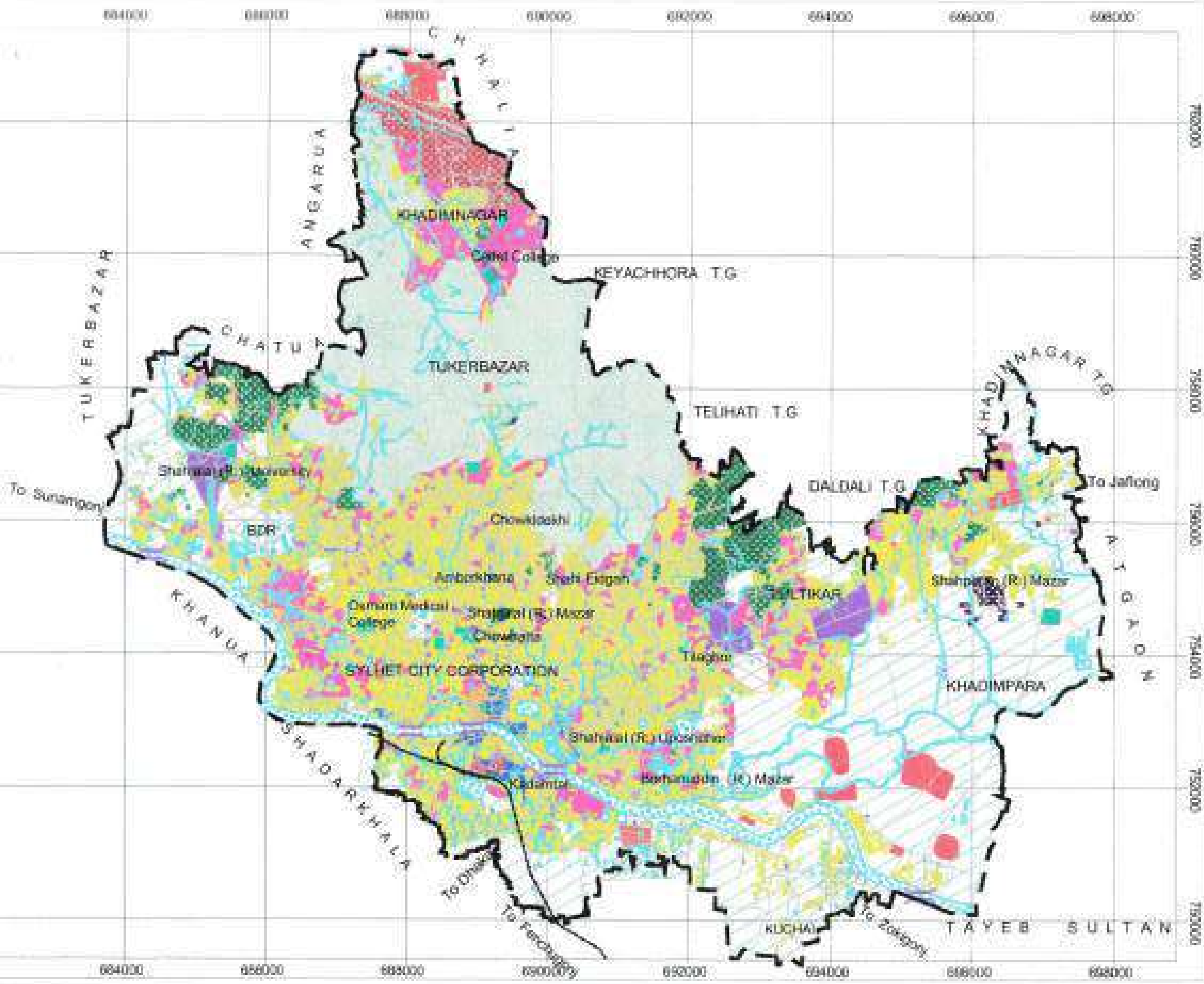

1 0 1 2 Kilometers

SCALE 1:85000

LEGEND

- Project Boundary
- Railway
- Bridge

Existing Landuse Pattern

- Administrative Services
- Agriculture
- Bus/Truck/Launch Terminal
- Community Centre
- Commercial (Business & Merchantile)
- Defence & Security
- Education & Research
- Grave Yard/Crematorium/Cemetery
- Health Care Services
- Industrial/Manufacturing & Processing Activity
- Mixed Use
- Non Government Services
- Open Space
- Power Plant/Station
- Recreational Facilities
- Religious
- Residential
- Rural Settlement
- Slum Area
- Tea Garden
- Tilla/Hilly Area
- Transport & Communication
- Vacant Land
- Waterbody

Preparation of Master Plan for Sylhet Divisional Town

Consultants:
Consortium
of
SHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants

২.৫ পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াস

২.৫.১ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং এ্যাকশান এরিয়া প্ল্যান

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮৭ সালে সিলেট শহরের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে শহর ও এর আশপাশ এলাকার জন্য প্রথম স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং প্রজেক্ট এর অধীনে (বিজিডি/৮১/০০৫) এটি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি UNDP এর আর্থিক সহায়তায় UNCHS কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত ছিল। তৎকালীন সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ক হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে ৬টি জেলা এবং ৫টি উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের যে উদ্যোগ নেয়া হয় তারই একটি অংশ হিসারে সিলেটের জন্য এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২.৫.২ স্ট্রাকচার প্ল্যানের পটভূমি

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর সিলেট। আশির দশকের শেষদিকে শহরটি একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ, একটি মেডিক্যাল কলেজ, অনেকগুলো মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। সিলেট দেশের চা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। দেশের বিভিন্ন অংশের সাথে সিলেটের ভালো সড়ক, নৌ ও আকাশপথে যোগাযোগ রয়েছে। আশির দশকের শেষ থেকে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে সিলেট খুব দ্রুত প্রবৃদ্ধি লাভ করছে।

২.৫.৩ স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্য

ক) শহরের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।
খ) সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও একটি সাধারন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
গ) শহরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি কাঠামো প্রস্তুত করা।

২.৫.৪ প্রকল্প এলাকা

স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়নের সময়ে সিলেট মিউনিসিপ্যাল এলাকার আয়তন ছিল প্রায় ৯.৭ বর্গ কি:মি: (৩.৫ বর্গমাইল)। প্রকল্প শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকার আয়তন নির্ধারণ করা হয় ১৯ বর্গ কি:মি: যাতে মিউনিসিপ্যাল এলাকা এবং আশেপাশের সম্ভাব্য এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত শহরের বৃদ্ধি ঘটবে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

২.৫.৪.১ উন্নয়নের কৌশলগত নীতিমালা

উন্নয়ন প্রস্তাবনায় কিছু উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কৌশলগুলোতে কর্মসংস্থান, অবকাঠামো, পরিবহণ ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জ্বালানীশক্তি, শিক্ষা এবং বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২.৫.৪.২ উন্নয়ন প্রস্তাবনা

স্ট্রাকচার প্ল্যানে বলা হয়েছে, শহরের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করবে বেসরকারী ভূমি মালিকেরা এবং সরকারী পর্যায়ে প্রধান ভূমিকা থাকবে মিউনিসিপ্যালটির। স্ট্রাকচার প্ল্যানে তিন ধরনের কাজের সুপারিশ করা হয়ঃ

১। সরকারী সংস্থা রাস্তা অথবা কোন পাবলিক ফ্যাসিলিটি তৈরীর মাধ্যমে একটি নতুন এলাকায় উন্নয়ন কাজের সুচনা করবে।
২। বর্তমানে যেসব সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন এলাকায় এই সুযোগ সুবিধাগুলোর সম্প্রসারণ।
৩। একটি সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই পরিকল্পনায় ২০ বছর সময়সীমার জন্য একটি উন্নয়ন প্রস্তাবনা সেট তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন তিন পর্যায়ে তিনটি সময়সীমায় বিভক্ত করা হয় যার মধ্যে ১৯৮৭-৯০ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫.৫ স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়ন

স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয় তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটিকে। কিন্তু এ দায়িত্ব সম্পাদনে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া পরিকল্পনা রিপোর্টে শহরের উন্নয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রদান করার কথা বলা হয়। এতে কোন ধরনের প্রশাসনিক পুর্নগঠনের সুপারিশ প্রদাণ করা হয় নাই। কিন্তু একই সাথে সুপারিশ করা হয় যে, পৌরসভা এলাকা উন্নয়ন কাজের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং সমন্বয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা পৌরসভা কর্তৃপক্ষেরই থাকা উচিৎ।

পরিকল্পনা রির্পোটে সমালোচনা করা হয় যে বর্তমান উন্নয়ন ধারায় ভূমি উন্নয়ন এবং নির্মাণকাজ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের অভাব রয়েছে এবং পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণে পৌরসভার নিস্ক্রিয়তা কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পৌরসভার দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও তা বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতার অভাব রয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যানে আশা প্রকাশ করা হয় যে পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যেই উপযুক্ত ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া হবে। এ ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে অবকাঠামো এবং সার্ভিসের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২.৫.৬ এ্যাকশান প্ল্যান

সিলেট শহরের পরিকল্পনা প্রণয়নের দ্বিতীয় স্তরটি ছিল এ্যাকশন প্ল্যান। এ্যাকশন প্ল্যানের উদ্দেশ্য ছিল স্ট্রাকচার প্ল্যানে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন করে একটি বিস্তারিত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রকল্পগুলোর বিশদ নক্সা ও ব্যয় নির্ধারণ করা। এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন স্ট্রাকচার প্ল্যান সময়সীমার প্রথম তিন বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে ধরা হয়। গভীরভাবে মূল্যায়নের পর স্ট্রাকচার প্ল্যানে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে ১৮ টি এ্যাকশন প্ল্যান প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ১৮টি প্রকল্পের ৮টি জাতীয় সরকারের অর্থায়নে এবং বাকি ১০ টি পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কিছু বিষয় বিবেচনা করেও এই ১০টি প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

- প্রকল্পটি মানুষের কতটুকু প্রয়োজন মেটাবে;
- নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেওয়া;
- খরচ মেটাবার জন্য প্রকল্প হতে অর্জিত লভ্যাংশ সংগ্রহ;
- প্রকল্পটি কতটা জরুরী;
- প্রকল্পটি প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার উৎসাহিত করে কিনা ;
- পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পটি কতটা সফল হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে ক্রমায়ণ করে ১০টি প্রকল্পের অগ্রাধিকার একটি তালিকা চূড়ান্ত হয় যা **সারণি-২.২** এ দেখানো হয়েছে।

ap 2.3 | Spatial Growth Pattern of the Project Area

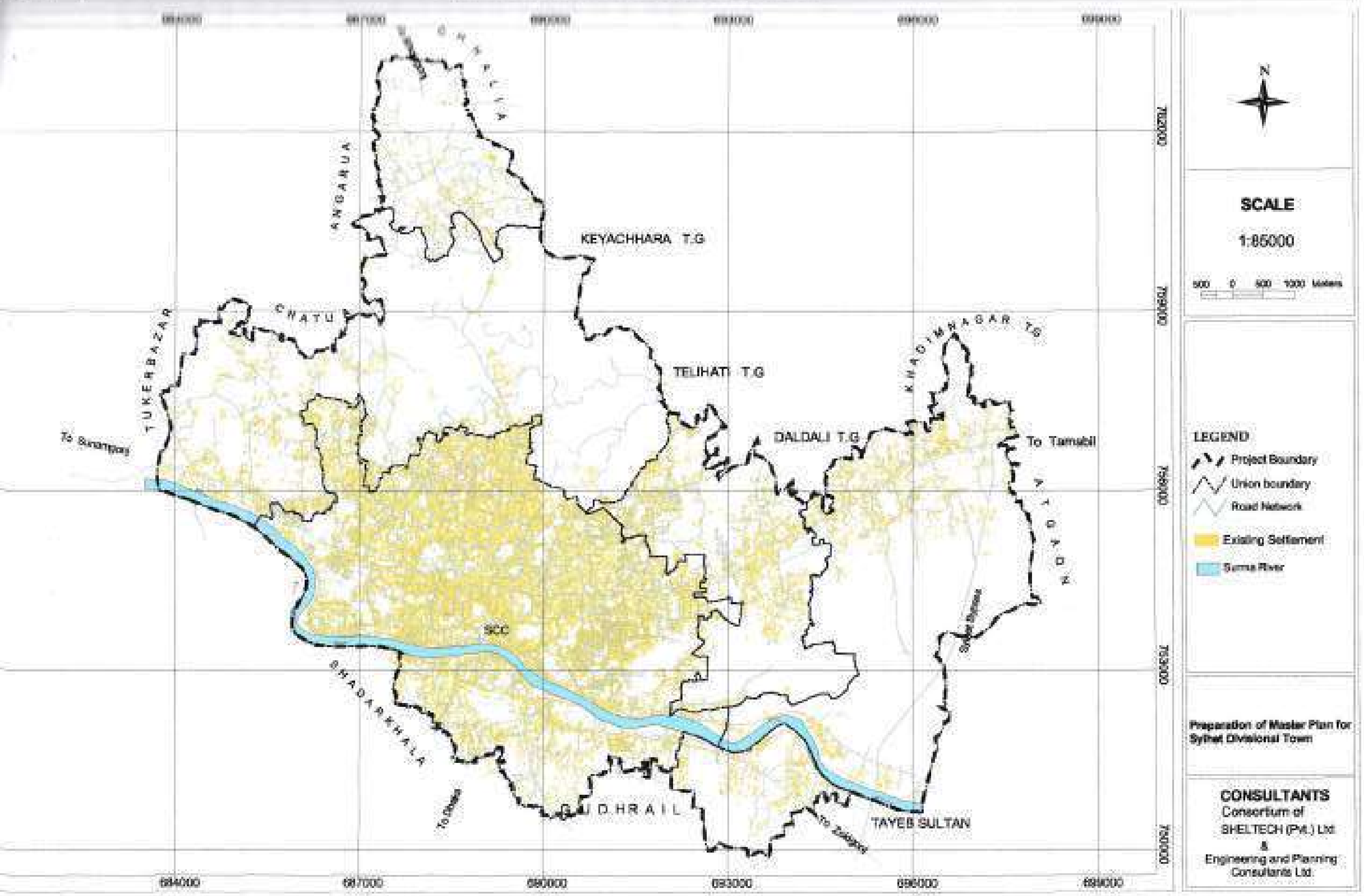

সারণি- ২.২: অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকা

পুরাতন ক্রমিক নং	নতুন ক্রমিক নং	প্রকল্প	স্কোর	ব্যয় (টাকা)	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (টাকা)
৪	১	উন্মুক্ত স্থানে টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন করা।	২৭.৫	৩৫৩০০	-
৭	২	২০০টি টিউব ওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করা।	২৭.৫	২২৫৬০০০	২৩০৮২০০
১৩	৩	কম্প্রিহেনসিভ ড্রেনেজ স্কীম তৈরী করা।	২৭.৫	১০০০০০০	৩৩০৮২০০
৫	৪	৩০টি স্ট্যান্ড পাইপ মেরামত করা।	২৬.৫	১৬৯০০	৫২২০০
১২	৫	কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	২৬.০	৫৬৬৬০০০	৮৯৭৪২০০
১১	৬	২০০০ টি সার্ভিস ল্যাট্রিনকে টুইন পিট ল্যাট্রিনে উন্নত করা।	২২.৫	৫১১০০০	৯৪৮৫২০০
৩	৭	উত্তরমূখী চলাচলকারী বাসসমূহের জন্য টার্মিনাল নির্মাণ।	১৯	১২২৬০০০	১০৭১১২০০
১০	৮	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।	১৯	১৫৪০০০	১০৮৬৫২০০
১	৯	কাঁচা রাস্তাকে ব্রিক পেভমেন্ট রাস্তায় রূপান্তর।	১৬.৫	৪৪৬১০০০	১৫৩২৬২০০
১৪	১০	কাঁচা ড্রেনসমূহকে ব্রিক লাইনিং এর মাধ্যমে উন্নয়ন করা।	১৪.৫	২৭৯৪০০০	১৮১২০২০০

২.৫.৭ পরিকল্পনা প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

স্ট্রাকচার প্ল্যানের প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করতে গিয়ে এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র পাওয়া যায়। সিলেট শহরের এই পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় নাই এবং আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি। এই পরিকল্পনায় সিলেট যে এক সময় বিভাগীয় সদরদপ্তরে পরিণত হবে তাও ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেনি। পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী ভূমি বন্টন করা হয়নি। এতে ধারণা করা হয় যে, ভবিষ্যৎ শহরের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কৃষি এবং অব্যবহৃত জমি থেকে সংগ্রহ করা হবে। যদিও পরিকল্পনায় বলা হয়েছে প্রতি ১০ বছর পর পর এই উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন বা পুনর্বিবেচনা করা হবে, যাতে উন্নয়নের ধারাকে ১০ বছর পর পর আধুনীকিকরণ করা যায়। কিন্তু কখনোই এই পরিকল্পনা সংশোধনের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। তাই সময়ের সাথে সাথে এই পরিকল্পনা ধীরে ধীরে তার গ্রহণ যোগ্যতা হারায়। এই ব্যর্থতার পেছনে মূল কারণ ছিল বিভিন্ন দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয় যেমন, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয়ের অভাব। এই ব্যর্থতার পেছনে আরও একটি কারণ হলো, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং অর্থ কোনটাই প্রদান করা হয় নাই। তদুপরি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং সিলেট পৌরসভা এর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় বা সমঝোতা না হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই।

২.৬ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের গৃহায়ন প্রকল্প (১৯৯০)

কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন সরবরাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলো জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষ দেশের আবাসন সমস্যা নিরসণে, বিশেষত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৫৮-১৯৯৭ সালের মাঝে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের পূর্বসুরি হাউজিং এন্ড সেটেলমেন্ট ডিরেক্টরেট শরনার্থী পূর্নবাসন প্রকল্প, নিম্ন আয় ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্প এবং বস্তি পুর্নবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ পর্যন্ত এই সংস্থা দেশজুড়ে ৩৪টি আবাসন প্রকল্প তৈরী করেছে যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় নাগরিক এবং অবকাঠামো সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। এই আবাসন প্রকল্পগুলো আবাসিক এবং পুনর্বাসন প্লট, ফ্ল্যাট, দোকান, বাণিজ্যিক, শিল্প ব্যবহার্য প্লট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, মসজিদ, পার্ক, খেলার জায়গা ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২টি সিলেট শহরে অবস্থিত।

১। শাহজালাল হাউজিং এস্টেট (প্রথম পর্যায়) এই প্রকল্পে ৭৪৭ টি বিভিন্ন ধরনের প্লট আছে যার মোট আয়তন ৬০ একর।

২। সিলেট হাউজিং এস্টেট (দ্বিতীয় পর্যায়) এই প্রকল্পে ৭৫৫ টি প্লট রয়েছে যার আয়তন ৬৫.৫ একর।

২টি হাউজিং এস্টেটই ২২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এবং স্থানীয়ভাবে শাহজালাল উপশহর হিসেবে পরিচিত, যাতে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকজন বসবাস করে।

২.৭ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সাইট এবং সার্ভিস পরিকল্পনা

সম্প্রতি কিছু এনজিও, কমিউনিটি বেইজড অরগানাইজেশন, সিসিও মিলিতভাবে বস্তির অবস্থা উন্নয়নে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার অর্থায়ন হচ্ছে বহিরাগত দাতা সংস্থা দ্বারা। সরকারী উদ্যোগে পৌরসভা অঞ্চলে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল।

২.৮ বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন

শহরে বিসিকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরী আছে-খাদিমনগর শিল্প নগরী এবং গোটাটিকায় বিসিক শিল্প নগরী। প্রকল্প দুটির কাজ শুরু হয় যথাক্রমে ১৯৮৫ ও ১৯৬৫ সালে এবং ১৯৯৭ সালে শেষ হয়। শিল্প নগরী দুটির সম্মিলিত আয়তন ৫২.৬৪ একর। এর মধ্যে ৩৯.০৬ একর ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্প এলাকা হিসাবে এবং বাকি এলাকায় আছে রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য অবকাঠামো। ২৫৩টি প্লটের মধ্যে ১৪১টি প্লট ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কারখানাকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। বর্তমানে উৎপাদন কাজ চলছে মাত্র ১০০ টিতে (সারণি-২.৩)। দেশের অন্যান্য বিসিক শিল্প নগরীর মত এখানেও শিল্প নগরী দুটির পূর্ন ব্যবহার সম্ভব হয় নাই।

সারণি- ২.৩: পরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত বিসিক শিল্প নগরী

শিল্প নগরীর নাম	অবস্থান	বাস্তবায়ন কাল	মোট শিল্প এলাকা	শিল্প ভূমি ব্যবহার	মোট শিল্প প্লট	বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট	উৎপাদন সক্ষম শিল্প	অন্যান্য ভূমি ব্যবহার
খাদিমনগর শিল্প নগরী	খাদিমনগর	১৯৮৫-১৯৯৭	২৭.৭৫ একর	১৯.১৬	১১৯	৬৯	৪৬	৮.৫৯ একর
গোটাটিকার শিল্প নগরী	গোটাটিকার	১৯৬৫-১৯৯৭	২৪.৮৯ একর	১৯.৯০	১৩৪	৭২	৫৬	৪.৯৯ একর
মোট			৫২.৬৪ একর	৩৯.০৬	২৫৩	১৪১	১০০	১৩.৫৮ একর

তথ্যসূত্র: বিসিক, সিলেট, ২০০৭।

২.৯ সড়ক পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল কার্যকরী এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। আর এক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও ভালো সড়ক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ। সিলেট অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে বর্তমানে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫টি প্রকল্প হল বিভিন্ন সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ যা নব্বই দশকের শেষ দিকে শুরু হয় এবং বর্তমানে শেষের পথে। এসকল প্রকল্পগুলো হলো:

- বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক;
- সিলেট-সালুতিকর-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কের অবশিষ্ট কাজ শেষ করা;
- ওসমানী বিমানবন্দর বাইপাস সড়ক নির্মাণ;
- সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের আম্বরখানা-তুকেরবাজার অংশের উন্নয়ন;
- সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কের উন্নয়ন;
- সিলেট শহরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের উন্নয়ন;
- মাসিমপুর সেতু পুর্ননিমান এবং সেতু যোগাযোগকারী সড়কের উন্নয়ন;

সিলেট সিটি কর্পোরেশনও শহরের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এগুলো হলো:

- ভিআইপি রোডের প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ এবং সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাত নির্মাণ (১/১/২০০৪-৩১/১২/২০০৭)।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- টিলাগড় এলাকার কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ।

দরিদ্রদের উপযোগী এবং সহজে পাওয়া যায় এমন একটি পরিবহণ মাধ্যম হল রেলওয়ে। বাংলাদেশ সরকার দ্রুত দারিদ্র নিরসনের জন্য জাতীয় কৌশলগত নীতিমালায় কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেলওয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভবপর হবে।

সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের রিমডেলিং (দ্বিতীয়, পর্যায়) প্রকল্পটির কাজ এই বছরে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে রেল পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে। ইন্টারলকিং এর আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব জোনভুক্ত আখাউড়া - সিলেট অংশের ১০টি স্টেশনের সিগন্যাল ব্যবস্থার উন্নয়ন আরো একটি প্রকল্প যা ২০০৮ সালে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশল

৩.১ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

এই অধ্যায়ে মূলত দুটি সাম্প্রতিক জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো- পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)।

৩.১.১ পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয় ১৯৯৭-২০০২ মেয়াদের জন্য। এই পরিকল্পনাটি পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে শুরু হওয়া পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় তৈরী করা হয়। এটি স্বাধীনতার পরে প্রস্তুতকৃত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সিরিজের শেষ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় ৭% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যা বাস্তবে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে এই পরিকল্পনা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে কিছুটা স্বনির্ভরতা আনতে সমর্থ হয়। পরিকল্পনাটি বেসরকারী খাতের প্রসারের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

ক. পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ

১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে দারিদ্র বিমোচন।
২) শ্রমঘন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
৩) নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন এবং রপ্তানী পণ্যের হার বৃদ্ধি।
৪) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।
৫) দেশের তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনা করে শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়ন।
৬) মৌলিক সেবা ও সুবিধা, যেমন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, কয়লা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন।
৭) গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করা, বিশেষত ইলেক্ট্রনিক্স এবং জিন প্রকৌশল।
৮) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৯) সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।
১০) কার্যকর স্থানীয় সরকার তৈরি করা। এই স্থানীয় সরকার হতে হবে প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম।
১১) সঠিকভাবে আয়, সম্পদ এবং সুযোগ বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

খ. নগর উন্নয়ন বিষয়ক খাতসমূহের উদ্দেশ্য

শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন এবং পানি সরবরাহ-এই তিনটি প্রধান বিষয় পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

১. ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা

১) নগরকেন্দ্র এবং গ্রামীণ এলাকাসমূহের জন্য ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।
২) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন এবং নগর এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন আয়ের লোকজনের জন্য "স্যাটেলাইট টাউন" গড়ে তোলা।
৩) নিম্ন আয়ের লোকজনের জন্য গৃহায়ন।
৪) বস্তিবাসীদের জন্য গৃহায়ন।
৫) বস্তি এলাকায় মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রদান।
৬) শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।
৭) প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সরকারী অফিস ও বসবাসের জন্য ভবন নির্মাণ।
৮) জেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে মৌলিক অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
৯) পানি এবং বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ।

১০) মেট্রোপলিটন এলাকায় যানজট নিরসণের জন্য রাস্তা নির্মাণ।
১১) আনন্দ ভ্রমণ ও বিনোদনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা।
১২) নির্মাণ সামগ্রী এবং নির্মাণ পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন।

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনায় নগরকেন্দ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা যায়নি। বিশেষতঃ এ পরিকল্পনা যে সময়সীমার জন্য করা তার মধ্যে একমাত্র খুলনা মেট্রোপলিটন সিটি ব্যতীত আর কোন শহরের পরিকল্পনাই প্রণয় করা হয়নি। কোন 'স্যাটেলাইট টাউন' বা 'বস্তি উন্নয়ন' কর্মসূচীও প্রণীত বা গৃহীত হয়নি।

৩.১.২ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পি আর এস পি)

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মিলেনিয়াম সামিট' এ জাতিসংঘে মিলেনিয়াম ডিক্লারেশন করে যাতে ১৮৯টি দেশ সমর্থন দেয়। এতে দেশগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে কিছু উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সম্মত হয়। এটি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস বা এমডিজি নামে পরিচিত। এতে মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং এর উপকারিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করা হয়। আন্তর্জাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহযোগিতার জন্য এটি একটি রোড ম্যাপ। এতে ৮টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়ঃ

১। অতি দারিদ্র এবং ক্ষুধা দূরীকরণ।
২। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা।
৩। সমঅধিকার এবং নারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
৪। মৃত্যু হার কমানো।
৫। মায়েদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন।
৬। এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ।
৭। পরিবেশগত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
৮। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য একটি সার্বজনীন অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা।

"এমডিজি" লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্য ২০০৩ সালে বাংলাদেশে 'দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র' প্রস্তুত করা হয়। এটি পঞ্চ-বার্ষি পরিকল্পনার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে কমপক্ষে ২০টি ক্ষেত্রকে উন্নয়নের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয়। পরিকল্পনা কমিশন ৯টি মন্ত্রণাল মাধ্যমে এই পরিকল্পনার ফিজিক্যাল প্ল্যানিং, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম (ডি পি) এর অধীনে বাস্তবায়ন করে। দ্বিতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সংসদে উপস্থাপিত হয়। এ নামকরণ হয় "পরিবর্তনের পদক্ষেপঃ দ্রুত দারিদ্র বিমোচনের জন্য জাতীয় কৌশল।" এর বাস্তবায়ন সময়সীমা ২০০৯-২০১ অর্থবছর।

ক. পি আর এস পি পর্যালোচনা

পি আর এস পির বস্তি উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচন বিষয়ক প্রকল্পগুলোতে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কিন্তু দাতা সংস্থা অর্থায়ন অপ্রতুল হওয়ায় এই পরিকল্পনার সময়সীমা বর্ধিত করে জুন ২০০৭ এর পরিবর্তে জুন ২০০৮ নির্ধারিত হয়। এছাড়া পি আ এস পি বাস্তবায়ন কমিটির মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের জন্য যেসব নির্দেশক (Indicator) নির্ধারণ করা হয়েছিল তা যথে নয়। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে, দারিদ্র বিমোচনের জন্য উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের ফলে কি পরিমাণ কর্মসৃজ হচ্ছে তা পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ছে (দৈনিক প্রথমআলো, ২০০৭)। অতএব, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে উন্নয়ন কা ত্বরান্বিত করতে হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশক নির্ধারন এবং সঠিক ও যথেষ্ট তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এছাড়াও, পি আর এস পি বাস্তবায়নের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের সা খাপ খায়না। যথোপযুক্ত কৌশলপত্র তৈরি করতে হলে শুধুমাত্র ব্যাংক এবং ফান্ড এর উপর নির্ভর না করে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহ নিশ্চিত করা দরকার। এ ধরণের পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের অংশগ্রহণ যা পি আর এস পি-তে উল্লেখযোগ্যভাবে অবহেলিত।

শহরাঞ্চলের জন্য এমডিজি লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য ৪টি বিশেষ কৌশল অনুসরণ করা যায়ঃ

(১) যে সব সকল শহর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক প্রভাব ফেলে তাদের জন্য 'ম্যাক্রো ইকোনমিক' কৌশল নির্ধারণ।
(২) শহরের অবকাঠামো এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এছাড়া পরিকল্পিত নগরায়ন এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী।
(৩) কর্মসৃজন প্রকল্প গ্রহণ।
(৪) শৃঙ্খলা ও আইন প্রতিষ্ঠা।

বর্তমান নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুনভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় আইন ও নিয়মের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল করতে হবে। সম্প্রতি যে স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে তা পি আর এস পি এর লক্ষ্য অর্জনে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

৩.২ নগর সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি, আইন, বিধি এবং নির্দেশনার আলোকে প্রণীত নির্ণায়ক

আলোচ্য অংশে জাতীয় পর্যায়ের যে সমস্ত নীতি, আইন, বিধি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো, নগর ব্যবস্থাপনা নীতি, ভূমি ব্যবহার নীতি, গৃহায়ন নীতি, নগর যোগাযোগ নীতি, পরিবেশ নীতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন নীতি, পর্যটন নীতি, কৃষি নীতি, জাতীয় বন নীতি, জনসংখ্যা নীতি, ইমারত নির্মাণ আইন, বিল্ডিং কোড, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য নীতি, ইত্যাদি।

৩.২.১ নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নগর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সামগ্রীক কোন নীতি প্রণীত হয় নাই। তবে নগর বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কিছু নীতি তৈরী করা হয়েছে।

৩.২.১.১ জাতীয় নগর বিষয়ক নীতি

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৪ সালে একটি জাতীয় নগর ব্যবস্থপনা নীতির খসড়া প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ, জন সচেতনতা তৈরী, জনগণের অংশগ্রহণ, সরকারী নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে টেকসই এবং সমতা ভিত্তিক নগর উন্নয়ন করা।

২০০৬ সালে জাতীয় নগর ব্যবস্থাপনা নীতির খসড়া তৈরী করা হয়। এতে নগর অঞ্চল সমূহের টেকসই, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রচনা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য ছিল নগরায়নের ইতিবাচক দিকগুলিকে শক্তিশালী করা এবং একই সঙ্গে নেতিবাচক বিষয়গুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলা করে টেকসই নগর উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা। খসড়া নীতির লক্ষ্য উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অর্জন, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এবং সিভিল সোসাইটির স্ব স্ব ভূমিকা থাকবে। খসড়া জাতীয় নগর বিষয়ক নীতির প্রধান প্রধান লক্ষ্য:

- উন্নয়ন ছড়িয়ে দিয়ে এবং স্তর বিশিষ্ট নগর কাঠামো তৈরী করে আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ন নিশ্চিত করা।
- উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরী করে, বৈষম্য এবং দারিদ্র হ্রাস করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করা।
- সরকারী-বেসরকারী এবং অন্যান্য পার্টনারশীপের মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ক্রমবর্ধমান আবাসন এবং মৌলিক নগর সার্ভিসের চাহিদা পূরণ করা।
- নগর পরিবেশ বিশেষত জলাধার রক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্তৃত্ব তৈরী করা এবং নগর স্থানীয় সরকারকে উপযুক্ত ক্ষমতা, সম্পদ, যোগ্যতা প্রদান করা যাতে তারা ব্যাপক ভাবে পরিকল্পনা, অবকাঠামো নির্মাণ, সার্ভিস প্রদান এবং উন্নয়ন এবং নগর ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- অংশ গ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির সকল খাতকে যুক্ত করা।
- ভূমি মালিকানা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন জীবনধারণমূলক পেশায় অংশ গ্রহণ এবং মৌলিক সার্ভিস প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী করে দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা তৈরী করে তাদের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।

- নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকালে মহিলা, পুরুষ, শিশু, যুব, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের সমস্যা এবং প্রয়োজন বিবেচনায় রাখা।
- বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধ এবং সন্ত্রাস হ্রাস করে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- শহরের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা, সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য্য বর্ধন।
- নগর ও গ্রামীণ এলাকার টেকসই উন্নয়নের জন্য সাহায্যক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে নগর ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ও সুশাসনের ব্যবস্থা করা।
- স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে সুশাসন নিশ্চিত করা।

বিশেষ বিবেচ্য বিষয়াবলী

- বাংলাদেশে শহরগুলো জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- বর্তমানে শতকরা প্রায় ২৬ জন লোক শহরে বাস করে এবং জিডিপিতে নগর এলাকার অবদান প্রায় ৪৫ শতাংশ।
- বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই নগরোন্নয়ন আবশ্যক।
- বাংলাদেশে ভারসাম্যহীনভাবে দ্রুত নগরায়ন সংঘটিত হচ্ছে।
- জাতীয় নগরায়ন নীতির লক্ষ্য হচ্ছে নগরায়নের ইতিবাচক দিকগুলিকে গুরুত্ব দেয়া, পাশাপাশি নেতি বাচক দিকগুলির ফলাফলগুলি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে টেকসই নগরায়ন নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশের প্রতিটি শহরের নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকা উচিত।
- কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- কৃষি থেকে অকৃষি খাতে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- নীতি কার্যকর করতে বাস্তবায়ন বিষয়ক সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।
- নগরাঞ্চল এবং গ্রামের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ গড়ে তুলতে হবে।
- কৌশল প্রণয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়নে যথাযথ প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে।
- নীতি নির্ধারণে দরিদ্রদের আবাসনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত।
- নগরায়ন ছড়িয়ে দেয়া এবং শহর-গ্রাম যোগাযোগ সুদৃঢ় করার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩.২.১.২ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১

দেশের ভূমি, বিশেষত কৃষি ভূমি সংরক্ষণের জন্য সরকার ২০০১ সালে জাতীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতি জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করে যার সঙ্গে বর্তমান পরিকল্পনা সঙ্গতিপূর্ণ। ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ২০০১ সালের জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিতে জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে ভূমির উৎপাদন এবং ভূমির ক্ষমতা, ভূমির ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তা, বনভূমি, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং গৃহায়ন। নিচে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় যে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে বলা হয়েছে তার প্রধান প্রধান দিকগুলি তুলে ধরা হলো।

১। উত্তরাঞ্চলের মরুকরণ রোধ কল্পে সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

২। কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করে ভূমি ক্ষয়, ভূমির উর্বরতা রক্ষা করতে হবে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। পাহাড়ী এলাকার ভূ-প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য পাহাড় কাটা এবং ভূমি খনন এবং অপসারণ বন্ধ করতে হবে। পাহাড়ী এলাকা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে পাথর এবং মাটি সংগ্রহ বন্ধ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। জলা ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। পরিকল্পিত আবাসন এবং/অথবা ব্যবহারের জন্য ভূমি শ্রেণী বিভাগকরণ এবং কার্যকরভাবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

৫। ভূমি ক্ষয় জনিত অথবা সরকারী হুকুম দখলের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৬। উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া, ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয় রোধ, ভূমির বহুমুখী ব্যবহার, উপকূলীয় এলাকা সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন, জলাভূমি প্রভৃতি বিষয় নিয়মিত মনিটরিং, জরিপ ও এগুলো নিয়ে গবেষণা করা।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিতে দেশের সীমিত ভূমির সর্বোত্তম এবং নিবিড় ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়। নীতিতে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, অপরিকল্পিত আবাসন উন্নয়ন রোধ, বিক্ষিপ্ত শিল্প এবং বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মান বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভূমি জোনিং করার কথা বলা হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিতে পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়।

পর্যালোচনা

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের পর তা বাস্তবায়নের জন্য এ যাবত কোন ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এই নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ক্রমশ গুরুতর সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩.২.১.৩ জাতীয় গৃহায়ন নীতি ১৯৯৩

১৯৯৩ সালে সরকার প্রথমবারের মত জাতীয় গৃহায়ন নীতি প্রণয়ন করে। গৃহায়ন খাতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে গৃহায়ন নীতির আর্টিকেল-২.৩ এ কতিপয় বৃহৎ শহরের ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ সমস্ত শহরে গৃহায়ন একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে নতুন আবাসন নির্মাণ এবং সরবরাহের কোন সরকারী উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। নীতিতে অপরিকল্পিত ও বিক্ষিপ্তভাবে আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠার উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। গৃহায়ন নীতির উদ্দেশ্যে (আর্টিকেল-৩.৩) অপরিকল্পিত ও অস্বাস্থ্যকর আবাসিক এলাকা নির্মাণ রোধের জন্য কার্যকর কৌশল প্রণয়নের উপর জোর দেয়া হয়। গৃহায়ন নীতির আর্টিকেল-৫.১.৪ এ আবাসন এবং অবকাঠামো নির্মাণ খাতে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। নীতিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আবাসন নির্মাণে কমিউনিটি, এনজিও, সিবিও, বেসরকারী উদ্যোক্তা এবং সমাজ কল্যাণ সংগঠনকে সহায়তার অঙ্গীকার করা হয় (আর্টিকেল-৫.২.৭)। নীতিতে নতুন লীজিং পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে। আর্টিকেল-৫.২.৮ এ স্থানীয় সরকারগুলিকে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে নীতিতে (আর্টিকেল-৫.৭) বলা হয়েছে যে সরকার আবাসন খাতে সবসময় সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। সরকার শুধু দরিদ্র এবং বাস্তুহারাদের আবাসন প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে (আর্টিকেল-৫.৭.১)।এই নীতিতে বেসরকারী সংস্থা, এনজিও এবং সিবিওকে আবাসন, অবকাঠামো এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে উৎসাহিত করার অঙ্গীকার করা হয় (আর্টিকেল-৫.৭.৩)।

পর্যালোচনা

প্রায় এক যুগেরও বেশি কাল পূর্বে গৃহায়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু নীতি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান এখনো দেশের গৃহায়ন সমস্যা নিরসনে উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ দেশের গৃহায়ন সমস্যা যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে পারে নাই এবং তা মোকাবেলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশে বেসরকারী খাতে আবাসন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে। বিশেষত বড় শহরগুলিতে বেসরকারী আবাসন ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত শহরে জমির উর্ধমূল্যের কারণে বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। তবে অংশগ্রহণমূলক আবাসন নির্মাণে এখনো কোন বিশেষ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নাই। সরকারী খাতে সাইট এবং সার্ভিস প্রক্রিয়ায় এখনো আবাসন নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে যা সাধারণ মানুষের আবাসন সমস্যা নিরশনে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

৩.২.১.৪ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

২০০৪ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিকভাবে দেশের জটিল জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলা করা। এর আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপারে সরকারী, বেসরকারী, সিভিল সোসাইটি এবং এনজিও সহ সকল সংস্থার মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য

জাতীয় জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসহ মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন। এ ছাড়া এমডিজি এ পিআরএসপি এর আলোকে জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের মধ্যে কাঙ্খিত ভারসাম্য এনে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও এই নীতি অন্যতম উদ্দেশ্য। জনসংখ্যা নীতিকে চারটি সেক্টরে ভাগ করা যায়- মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা কর্মকান্ড বিকেন্দ্রীকর জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে এনজিও ও বেসরকারী সংস্থা সমূহকে সম্পৃক্তকরণ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষা বিস্তার এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে একটি বিশাল দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা। এ শিক্ষার সকল স্তরে জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই নীতির আওতায় বি স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মাতৃ এ শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরী করে ম্যানেজার এবং সার্ভিস প্রদানকারীদের শিক্ষা এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ জনসংখ্যা নীতির আর একটি সুপারিশ। এতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীক করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগনের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা এবং আরো নিচে ক্ষমতা অ করতে হবে। এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য, জনসংখ্যা কার্যক্রম স্থানীয় গণ্যমান্যদের সম্পৃক্তকরণ, জনমত তৈরী, দরিদ্র ও ম প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির সমন্বয়ে এ্যাকশান প্ল্যান তৈরী করা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটিগু ক্ষমতা দিয়ে ও অর্থ সংগ্রহ করে মানব উন্নয়ন এবং পল্লী এলাকায় অধিকতর জনসংখ্যা সেবা প্রদান করা। এ জন্য স্বচ্ছ এ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার তৈরী করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে হ এ জন্য ইউনিয়ন এবং নিম্ন পর্যায়ে মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

এনজিও এবং বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণ

জনসংখ্যা নীতিকে একটি ব্যাপকভিত্তিক রূপ প্রদানের জন্য এনজিও এবং বেসরকারী খাতকে নীতি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশী হিসাবে নিতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে এদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করতে হবে

ক) সেবা সুবিধা বহির্ভূত এলাকায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সেবা প্রদান করার জন্য রেজিষ্টার্ড এন জি ও দের সহায়তা নি হবে।

খ) বিশেষত দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিতদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের জন্য এন জি ও দের উৎসাহিত ক হবে।

গ) দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিতদের দেরিতে বিয়ে এবং দেরিতে সন্তান গ্রহণ, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি এবং STIs, RTIs, HIV/AIDS বি সচেতনতা তৈরী করতে হবে ।

ঘ) জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কমিউনিটিকে সংগঠিত করার জন্য এন জি এবং বেসরকারী খাতকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) কাজে দ্বৈততা এড়ানোর জন্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন সংস্থার ম সমন্বয় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পিত পরিবার তৈরী

জনসংখ্যা নীতিতে দেশের জনসংখ্যাকে বিদ্যমান সীমিত সম্পদের পরিপূরক রাখার জন্য ' একটি ভালো দুটি সন্তানের বেশি নয়' এ স্লোগান জনপ্রিয় করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

ক) এই নীতি জনসংখ্যা নীতির কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডাক্তারদের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছে। এজন্য এ কাজে সরকারী বেসরকারী ডাক্তারদের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

খ) RTI/STI এবং HIV/AIDS প্রতিরোধ করে ভালো প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ডাক্তারদের নিয়োজিত করতে হবে।

গ) পরিবার পরিকল্পনা সেবার পাশা পাশি ডাক্তারদের দায়িত্ব হবে রোগীদের তথ্য, শিক্ষা প্রদান এবং উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ) সকল সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিতভাবে মাতৃ এবং শিশুস্বাস্থ্য সহ পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিস প্রদান করা।

আইনগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ

এই নীতির লক্ষ্য অর্জন এবং নীতি বাস্তবায়নের জন্য এক গুচ্ছ আইনগত এবং সামাজিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

১। জনসংখ্যা নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় জনসংখ্যা সমস্যার কার্যকরী সমাধান এখনো পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যথেষ্ট উদ্যোগ না নেয়ায় ' একটি ভালো, দুটির বেশি নয়' স্লোগান এখনো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নাই।

২। জনসংখ্যা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের অংশ গ্রহণ, স্থানীয় সরকার এবং প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়ন করে জনসংখ্যা এবং স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয় নাই। এ কারণে দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে যা সামনে কঠিন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৩.২.১.৫ জাতীয় পরিবহন নীতি

জাতীয় পরবহন নীতি ২০০৪ সালে তৈরী করা হয় যার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সার্ভিস প্রদান করা।

২। অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ দূর করে সেবা প্রদানের অনুকূল বিধি বিধান তৈরী করা।

৩। ভাড়া নিয়ন্ত্রণ।

৪। সরকারী এবং বেসরকারী খাতের ভূমিকা নির্ধারণ।

৫। অর্থনীতি এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন।

৬। সরকারী তহবিলের সর্বোচ্চ ভালো ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৭। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিপূরক হিসাবে পরিবহণ ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা।

৮। রপ্তানীযোগ্য পণ্যের পরিবহণ ব্যয় হ্রাস করা।

৯। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

১০। বৃহত্তর ঢাকার জন্য পরিবহণ নীতি প্রণয়ন করা।

১১। সমন্বিত পরিবহণ নীতি প্রণয়ন করা।

১২। বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরী করা।

১৩। উন্নত জীবন ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা।

১৪। দারিদ্র বিমোচন।

পরিবহন নীতিতে রাস্তা, সড়ক যানবাহন, অযান্ত্রিক বাহন, রেল এবং সমন্বিত ইস্যু সম্পর্কে আলোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে। "স্ট্র্যাটেজিক পলিসি ইস্যুতে" নিম্নবর্ণিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

বেসরকারী খাতের অধিকতর অংশ গ্রহণ

রাস্তা এবং অবকাঠামোর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ঠিক রেখে এগুলোর উন্নয়ন ও পরিচালনায় বেসরকারী অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে অবকাঠামো লীজ দেয়া যেতে পারে; অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারী অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা যেতে পারে।

পরিবহণ খাতের কার্যকর সমন্বয়

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর সঙ্গে ভালো সমন্বয় সাধন করতে হবে। সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে ভা কর্মসংযোগ তৈরীর লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়ম/নীতি এবং প্রবিধান তৈরী করতে হবে। নীতি বাস্তবায়নের জন্য আলোচনা এ পরামর্শ ফোরাম তৈরী করতে হবে। আরো ভালো সমন্বিত কর্ম সম্পর্ক তৈরীর জন্য সরকারকে প্রতিটি সেক্টরের জন্য পরিষ্কার উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

যানবহন ব্যবহারকারীদের সুবিধা বৃদ্ধি

সরকার জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে যানবাহন ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ যায় তার ব্যবস্থা করবে। এ জন্য যোগাযোগ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যে যানবাহণ ব্যবহারকারীদের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়া হ

যানবাহন ব্যবহারকারীদের সার্ভিস ব্যয় বহন করতে হবে

নতুন রাজস্ব নীতি তৈরী করে যানবাহন ব্যবহারকরীদের কাছ থেকে যানবাহন পরিচালনা এবং সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয় পু করতে হবে। ভাড়া বিধি তৈরী করে সরকারকে সড়ক এবং রেল পথে যাত্রী এবং মালামাল পরিবহণের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

পরিবহণ সেবায় ভর্তূকি

জনস্বার্থ বিবেচনা করে সরকারকে পরিবহণ সেবা খাতে প্রয়োজনীয় ভর্তূকি দিতে হবে।

জনসচেতনতা তৈরী

পরিবহণ নীতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করতে হবে।

পর্যালোচনা

১। এ যাবত সরকারের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ কখনোই কার্যকরী করা যায় নাই।
২। সড়ক নিরাপত্তা কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীণ।
৩। রক্ষাবেক্ষণের অভাবে সড়ক ব্যবস্থায় অবস্থা অত্যন্ত করুণ।
৪। তবে পরিবহন সেবায় বেসরকারী খাত সফল ভূমিকা রাখছে।
৫। যথা সময়ে কার্যকির ব্যবস্থা না নেয়ায় ঢাকা শহরের পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক।
৬। রেল খাতের উন্নয়ন অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক।
৭। পরিবহন খাতে জনগণের অংশ গ্রহণ অত্যন্ত সীমিত।

৩.২.১.৬ জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২

সরকার পরিবেশ রক্ষার জন্য ১৯৯২ সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষণা করে। পরিবেশ নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন অর্জন।
২। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা।
৩। দূষণ এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের উৎস নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ।
৪। সকল সেক্টরে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
৫। পরিবেশ বিষয়ক সকল আন্তর্জাতিক বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়া।

সামগ্রিক পরিবেশ নীতি বহু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে, যেমন, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন, জ্বালানী, পানি স এবং সেচ, ভূমি, বন, বন্যপ্রাণী, মাছ এবং প্রাণী সম্পদ, খাদ্য, উপকূল এবং সমুদ্র পরিবেশ, যাতায়াত এবং যানবাহন, আবাসন নগরায়ন, জনসংখ্যা, শিক্ষা এবং জনসচেতনতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষনা, আইন কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এ পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে শুধু সে ধরনের বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

শিল্প খাত

শিল্প খাতের জন্য পরিবেশ নীতিতে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে:

১। নির্বাচিত শিল্প সমূহের জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে।
২। সম্ভাব্য দূষণকারী শিল্পকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ভেতরে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৩। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে EIA সম্পন্ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৪। আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সকল শিল্পকে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পিত শিল্প স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।
৫। যে সমস্ত শিল্প পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং যে সমস্ত শিল্প অপচনশীল দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করতে হবে।
৬। যে সমস্ত শিল্প বিষাক্ত বর্জ্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে সে গুলি নিষিদ্ধ করতে হবে।
৭। পারদ, ক্রোমিয়াম, লীড এর মত ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার করে যে সমস্ত শিল্প সেগুলিকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
৮। যে সমস্ত শিল্প দূষণ তৈরী করে সেগুলিতে দূষণ উৎপাদন মনিটরিংএর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৯। বর্জ্য পরিশোধণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য 'waste permit/consent order' পদ্ধতি চালু করতে হবে।
১০। বর্জ্যের পরিমান হ্রাস করার জন্য এবং পুর্নব্যবহারোপযোগী ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
১১। শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে হবে।

স্বাস্থ্য খাত

এই খাতের পরিবেশ নীতিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির উপর জোর দেয়া হয়েছে:

১। শহর এবং পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং সাশ্রয়ী সেনিটেশন ব্যবস্থা প্রচলণ।
২। সকল শ্রেণীর জলাশয় মিউনিসিপাল, শিল্প বর্জ্য এবং শিল্প জাত বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা দূষিত হওয়া নিয়ন্ত্রণ।
৩। দিনের বেলা এবং খোলা ট্রাকে বর্জ্য পরিবহন নিষিদ্ধ করা।
৪। এক্সরে, পারমানবিক বর্জ্য, বিকিরণ উৎপাদনকারী সকল পণ্য, এটমিক রি-এক্টর এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর গবেষণা ও কার্যক্রম থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে।
৫। শিক্ষা কার্যক্রমে পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

জ্বালানী খাত

১। জ্বালানী সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য ব্যপক ভিত্তিক উন্নত চুলা প্রযুক্তি ও এর বিকাশ প্রকল্প হাতে নিতে হবে।
২। পল্লী এলাকায় কয়লা, কেরোসিন এবং পেট্রোলের ব্যবহার জনপ্রিয় করতে হবে যাতে কাঠ, কৃষি বর্জ্য, এবং গোবর সংরক্ষণ করে তা সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
৩। জ্বালানী উৎস হিসাবে পল্লী এলাকায় বায়োগ্যাস, সোলার এনার্জী, ক্ষুদ্র হাইড্রো বিদ্যুৎ ইউনিট এবং উইন্ড মিল এর বিকাশ ঘটাতে হবে।
৪। জ্বালানীতে ক্ষতিকর উপাদান যেমন, ডিজেলে সালফার এবং পেট্রোলে লীড ব্যবহার হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫। বিকল্প জ্বালানী উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা জোরদার করা।
৬। প্রাথমিক এবং বাণিজ্যিক জ্বালানী যাতে পরিবেশের ভারসাম্য এবং পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ফেলে সে দিকে লক্ষ্য রাখা।
৭। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন, গ্যাস, তেল, কয়লা, পিট) উত্তোলন বা বিতরণের পূর্বে যাতে এগুলো পানি, বাতাস, ভূমি, হাইড্রোলজিক্যাল এবং ইকো সিস্টেমের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
৮। পরিবেশ বান্ধব পেট্রোলিয়াম (যেমন, লীড মুক্ত) ব্যবহারের উপর সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে।
৯। গাড়ীর ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এগুলো কালো ধোয়া উদগীরণ না করে। ভ্রাম্যমান আদালত দ্বারা এ সমস্ত বিধি প্রয়োগ করতে হবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ খাত

১। রাস্তা নির্মাণ পরিবেশ সম্মতভাবে হতে হবে এবং রাস্তা যাতে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
২। যাত্রী এবং পরিবহণ থেকে নিক্ষিপ্ত বর্জ্য যাতে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩। রেল এবং জলযান থেকে অতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমণ বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪। নদী দূষন সম্পর্কে জন সচেতনতা তৈরী করতে হবে।
৫। অভ্যান্তরীণ নদী বন্দর এবং ডকইয়ার্ডে পানি দূষন নিয়ন্ত্রন করতে হবে।
৬। পরিবেশ বিপর্যয় না ঘটিয়ে বিমানবন্দর নির্মাণ করতে হবে।
৭। বিমান কর্তৃক বাতাস এবং শব্দ দূষন হ্রাস করতে হবে।
৮। কম দূষণ উৎপাদন করে এ ধরনের রেল ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হবে।
৯। রাস্তা এবং রেল লাইনের দুধারে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।

জনসংখ্যা খাত

১। পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
২। পরিবেশ সম্মতভাবে এবং কার্যকরভাবে যাতে জন সম্পদ ব্যবহার করা যায় সে জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
৩। পরিবেশ সংরক্ষনে মহিলাদের অংশ গ্রহণের উপর জোর দিতে হবে।
৪। জনসংখ্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
৫। যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠী পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে জন্য তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

পর্যালোচনা

১। দূষণকারী শিল্পের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই।
২। আবাসিক এলাকা থেকে শিল্প অপসারণ বিষয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
৩। 'Waste permit/consent order' পদ্ধতি প্রচলনে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
৪। জলাশয়ে মিউনিসিপ্যাল, শিল্প এবং শিল্প বর্জ্য দ্বারা দূষন রোধের জন্য কোন ধরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ঢাকা সহ অন্যান্য শহরের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক।
৫। দিনের বেলা এবং খোলা ট্রাকে বর্জ্য পরিবহন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই।
৬। উন্নত চুলা জনপ্রিয় করার ব্যাপারে কার্যকর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই।
৭। নদী দূষন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় নাই।
৮। রেল লাইনের দুপাশে বনায়নে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই।

৩.২.১.৭ শিল্প নীতি ২০০৫

শিল্প নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১। প্রকৃত অভ্যান্তরিন চাহিদা, রপ্তানীর সম্ভাবনা বিবেচনা করে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্প স্থাপন এবং অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন নিরুৎসাহিত করা।
২। বেসরকারী খাতকে অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। সরকারী সুবিধাগুলিকে অনুকূল পরিবেশ হিসাবে বিবেচনা করে বেসরকারী খাতের বিকাশ ঘটাতে হবে।
৩। প্রাইভেটাইজেশন কমিটি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প বিক্রয়/লীজ অথবা পরিচালনার ব্যবস্থা করে বেসরকারী খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
৪। যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেসরকারী উদ্যোক্তা এগিয়ে আসছে না সে সমস্ত খাতে সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করতে হবে।

৫। স্থানীয় এবং বৈদেশিক বাজারের জন্য এবং স্থানীয় ভোক্তাদের সন্তুষ্টির জন্য পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক) বিশ্ব মানের উন্নত পণ্য উৎপাদন করতে হবে।
খ) পণ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ করতে হবে।
গ) উৎপাদন ব্যবস্থাকে সাশ্রয়ী করতে হবে।
ঘ) শিল্প উৎপাদনে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করতে হবে।
ঙ) চলমান, উপযুক্ত এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

৬। বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দ্রুত বিকাশের জন্য কুটির শিল্প এবং এসএমই খাতকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরী হয় এবং বেকারত্ব হ্রাস পেয়ে দেশের দারিদ্র দূরীকরণ ত্বরান্বিত হয়।

৭। কৃষি ভিত্তিক এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিকাশে অগ্রাধিকার দিতে হবে। হাঁস-মুরগি, ডেইরি এবং ছাগল-ভেড়া পালন কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসাবে ধরে এগুলোর বিকাশে সহায়তা দিতে হবে।

৮। নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেক্টরে শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, পর্যায়ক্রমে উচ্চ মূল্য সংযোজন পণ্য উৎপাদন করতে হবে; উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং বহু শ্রেণীর পণ্য রপ্তানী করে রপ্তানী বৃদ্ধি করতে হবে।

৯। পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে যাতে শিল্প খাতে একটি দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরী করা যায়।

১০। স্থানীয় বাজারকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপন করে উচ্চ মূল্য সংযোজিত গার্মেন্ট পণ্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সাব-সেক্টরে পণ্য উৎপাদন করতে হবে।

১১। দেশের প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে শিল্প খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে।

পর্যালোচনা

১। শিল্প নীতিতে বিশেষ শিল্প এলাকা বা শিল্প এস্টেট স্থাপন সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। এ ধরনের শিল্প এলাকা স্থাপন করলে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা যেতো এবং শিল্প সহায়ক সার্ভিস সুবিধা প্রাপ্তি সহজতর হতো।

২। শিল্প স্থাপনে যৌথ উদ্যোগের বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করতে পারলে স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরী হতো এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর সহজতর হতো।

৩.২.১.৮ জাতীয় পর্যটন নীতি

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে সরকারী উদ্যোগে পর্যটন শিল্প বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশে পর্যটনের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে, এদেশের বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাচীন স্থাপনা, বৌদ্ধ ঐতিহ্য, অধিক সংখ্যক ইকো-টুরিজম এলাকা এবং পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পর্যটনের অবদান অনুধাবন করে সরকার ১৯৯২ সালে জাতীয় পর্যটন নীতি ঘোষণা করে। এই নীতিতে পর্যটন শিল্পের বিদ্যমান অবস্থা, এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বর্ননা করা হয়েছে এবং নীতি বাস্তবায়ন স্তর সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে ঘোষিত জাতীয় পর্যটন নীতির উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

১। জনগণের মধ্যে পর্যটন সম্পর্কে আকর্ষণ তৈরী করা।
২। পর্যটন সম্পদ রক্ষা, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ করা।
৩। কর্মসংস্থান তৈরী করে দারিদ্র হ্রাস করা।
৪। বিদেশে দেশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরী করা।
৫। চিহ্নিত সেক্টরগুলোতে বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ তৈরী করা।
৬। বিনোদন সুবিধা তৈরী করা।
৭। জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি শক্তিশালী করা।

এই নীতিতে পর্যটনকে একটি বহুমূখী শিল্প হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এর উন্নয়নের জন্য একাধিক সরকারী মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং বিভিন্ন সোসাইটির কার্যকর সমন্বয়ের উপর জোর দেয়া হয়। নীতি অনুযায়ী বেসরকারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে ট্যাক্স হলিডে, ঋণ, হ্রাসকৃত কর, ভূমি বরাদ্দ প্রভৃতি সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

৩.২.১.৯ কৃষি নীতি

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের কৃষি নীতি প্রণয়ন করা হয়। একটি নতুন কৃষি নীতি বর্তমানে প্রণয়নাধীন আছে। কৃষি নীতিতে যে
বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, বীজ, সার, সেচ, কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, কৃষি গবেষণা, সম্প্র
সার্ভিস, কৃষি বিপনণ, ভূমি ব্যবহার, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, পরিবেশ এবং কৃষি, নারী এবং কৃষি, কৃষি উন্নয়নে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার
সমন্বয়। এখানে শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ভূমি ব্যবহার

নীতিতে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যদিও ভূমির
ব্যক্তিমালিকানাধীন, তবুও সাধারণভাবে ভূমিকে সামাজিক লক্ষ্য এবং উপযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।
প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ তাই তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে ভূমি ব্যবহার করে কৃষি উৎপা
জন্য নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয়:

- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এসআরডি) কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভূমি জোনিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। এই
এসআরডি এর সমন্বিত কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করা হবে।
- ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বটম আপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। এ কাজ করা হবে জনগণের অংশ
মাধ্যমে এবং এর বাস্তবায়ন শুরু হবে মৌজা বা গ্রাম থেকে।
- অধিকাংশ স্থানে একই ধরনের জমি বিবিধ ফসলের জন্য উপযুক্ত। এ জন্য কৃষকদের ধানের বিকল্প অধিক লাভজনক
উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে।
- অকৃষি ব্যবহার (যেমন, ইমারত নির্মাণ, ইট ভাটা) বৃদ্ধির কারণে উর্বর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ভূমি
আওতায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ধারা বন্ধ করতে হবে।
- প্রধান ফসলের সঙ্গে সাথী ফসল চাষ করে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধি গ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হবে।
- কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ভূমি অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে না রাখার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সচেতনতা
করতে হবে।
- ভূমি নীতির আলোকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে এবং কৃষি জমি যাতে
সময় পতিত অবস্থায় রেখে না দেয়া হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পর্যালোচনা

১। প্রতি বৎসর এক শতাংশে জমি কৃষি থেকে অকৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এমন একটি দেশে যেখানে ক্রমাগত হারে জনসংখ
ঘটছে। কৃষি ভূমি হ্রাস পেলে ভবিষ্যতে খাদ্য উপাদন হ্রাস পাবে এবং এতে সরাসরি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ জন্য ভূমি
রূপান্তর অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বিষয়টি ভূমি নীতিতে সে ভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় নাই। এতে শুধু উর্বর ভূমি রূপা
কথা বলা হয়েছে, সার্বিকভাবে কৃষি ভূমি নয়।
২। সরকার এখনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে কার্যকর কোন পদ্ধতি তৈরী করতে পারে নাই।
৩। কৃষি ভূমি রক্ষার জন্য অবিলম্বে কৃষি ভূমি সংরক্ষণের পদক্ষেপ নিতে হবে। পৌরসভাগুলোতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কৃষি ভূ
র্ভুক্ত করা হচ্ছে। অনেক স্থানে দেখা যায়, পৌরসভার মোট আয়তনের ৭০ শতাংশই কৃষি ভূমি।

৩.২.১.১০ জাতীয় বন নীতি

১৯৭৯ সালে প্রণীত বন নীতি সংশোধন করে ১৯৯৪ সালে নতুন বন নীতি প্রণয়ন করা হয় যা ৩১ মে ১৯৯৫ গেজেট করা হ
নীতির অধীনে ২০ বৎসর মেয়াদী একটি ফরেস্ট মাস্টার প্ল্যান তৈরীর কথা বলা হয়। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাং
জাতিসংঘের সহায়তায় দেশের বন সম্পদ রক্ষার জন্য ১৯৯৪ সালে একটি ফরেস্ট মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়। এতে
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- টেকসই, দক্ষতা এবং জনগণের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৪ সালের বন নীতির উদ্দেশ্যঃ

- বনভূমি, কৃষির অযোগ্য ভূমি, হিন্টার ল্যান্ড এবং অন্যান্য ভূমির ২০ শতাংশ ভূমিতে বনায়ন করে বর্তমান এবং ভবিষ্যত বংশধরদের চাহিদা পুরণ করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
- বিদ্যমান অধঃপতিত বনভূমি রক্ষা করে জীব বৈচিত্র উন্নয়ন করা এবং পাখী ও প্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ করা।
- কৃষি সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলিতে সহায়তা সম্প্রসারণ করে (বিশেষত ভূমি এবং জলাশয়) কৃষি খাতকে শক্তিশালী করা।
- বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা জাতীয় অঙ্গীকার এবং দায়িত্ব পালন করা। বৈশ্বিক উষ্ণতা, মরুকরণ, বন্য পাখী এবং প্রাণী দিয়ে বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে সরকার কর্তৃক অঙ্গিকারকৃত চুক্তি পালন করা।
- বনভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা, অবৈধ বৃক্ষ নিধন, অবৈধ বন্য প্রাণী শিকার রোধ করা।
- বনজ সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে বনায়ন কার্যক্রমে সহায়তা করা।

১৯৯৪ সালের জাতীয় বন নীতিতে বর্ণিত বিষয়সমূহঃ

- কমিউনিটি ফরেষ্ট্রী এবং সামাজিক বনায়ন বিষয়ক জমি লীজ প্রদানের সময় দরিদ্র কমিউনিটি এবং সমাজের দরিদ্র মানুষকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- আয়ের জন্য ভূমি নেই এমন নারী এবং দরিদ্র মানুষদের নার্সারী, বৃক্ষ রোপন, বন ব্যবস্থাপনা, গাছ কাটা এবং বন শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।
- কমিউনিটি বৃক্ষ রোপন, রাস্তার পাশে কমিউনিটি বা পরিবার ভিত্তিক বৃক্ষ রোপন, উইন্ড ব্রেক, খাল/নদী, এবং অন্যান্য সরকারী জমিতে বৃক্ষ রোপন কাজে এনজিও বা সংশ্লিষ্ট সরকারী এজেন্সিকে কাজে লাগানো হবে।
- ফার্মে এবং বেসরকারী ভূমিতে বৃক্ষ রোপনে মালিকানা বা অধিকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।
- সংরক্ষিত এলাকার পাশে বাফার জোন বৃক্ষ রোপনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দেয়া যেতে পারে।
- গৃহস্থালী বনায়নের জন্য সরকার সব ধরনের কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে।
- পল্লী এলাকায় অবস্থিত শ্রম ঘন ক্ষুদ্র শিল্প এবং যে সমস্ত শিল্প কাঠ প্রক্রিয়াকরণ কাজে নিয়োজিত এবং বন সংক্রান্ত অন্যান্য কাঁচামাল তৈরী করে স্থানীয় অর্থনীতিকে সহায়তা করে সেগুলিকে রাষ্ট্র সহায়তা প্রদান করবে।
- বাইরের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তা বৃক্ষ চাষী এবং অন্যান্য উৎপাদনকারীদের সহায়তার জন্য প্রদান করা হবে যাতে বনায়ন হয় এবং বন ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন করা যায়।
- যদিও বন বিভাগ জাতীয় বনভূমি ও পল্লী এলাকায় বনভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তবুও যে সমস্ত স্থানে ব্যাপক চাহিদা আছে সেসমস্ত স্থানে জনগনের চাহিদা অনুযায়ী অংশগ্রহণ ভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজ করা হবে।
- নির্দিষ্ট বন এলাকার কাছাকাছি বসবাসকারী অধিবাসীরা সেখানে বসবাস করতে থাকবে এবং তাদের বন সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করা হবে।
- রাষ্ট্র বন ধ্বংস নিরুৎসাহিত এবং ফার্ম ফরেষ্ট্রী উন্নয়নের জন্য ভূমি নীতি, কৃষি নীতি, শিল্প নীতি, বাণিজ্য নীতি, রাজস্ব এবং অন্যান্য নীতি সংস্কার করবে।
- সামাজিক বনায়নের জন্য বন বিভাগকে পূণর্গঠন এবং শক্তিশালী করা হবে।

৩.২.১.১১ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৮-২০১৫ বাংলাদেশে বৃহত্তর পরিসরে দুর্যোগ প্রশমনের লক্ষ্যে প্রণীত একটি দেশী এবং আন্তর্জাতিক প্রয়াসের ফসল। এটি প্রণীত হয়েছে সরকারের রূপকল্প এবং খাদ্য এবং দুর্যোগ প্রশমন মন্ত্রণালয়ের দরিদ্র মানুষের প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মনুষ্য কর্তৃক তৈরী করা বিপর্যয় ঘটিত বিপদ থেকে রক্ষার প্রয়াসের অংশ হিসাবে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে, ক) দুর্যোগ মোকাবেলায় সনাতন রিলিফ নির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ব্যাপক ভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস সংস্কৃতি গ্রহণ। খ) সকল স্তরে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালী করে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে দক্ষ করে তোলা।

উদ্দেশ্য

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় অগ্রাধিকার এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় নিয়ে যেতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে রূপকল্প এবং জাতীয় লক্ষ্যের পরিপূরক করতে হবে।

- কৌশলগত নির্দেশনা এবং অগ্রাধিকার তৈরী করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি এবং কার্যক্রম এ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সরকারী এবং বেসরকারী খাতের সমন্বয়ে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত এবং সর্বোত্তম সমন্বিত কার্যক্রম কাঠামো তৈরী করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য কার্যকরভাবে তৈরী করতে হবে।
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়, এনজিও, সিভিল সোসাইটি এবং বেসরকারী খাতের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে হবে, কিভাবে তাদের কা কৌশলগত লক্ষ্য এবং সরকারী রূপকল্পের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

পর্যালোচনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একটি ঐতিহাসিক দলিল যা সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য। এতে সকল স্টেকহোল্ডারকে সঙ্গে একত্রে কা করার প্রবণতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে সরকারী এবং অন্যান্য প্রধান বেসরকারী সংস্থার (যেমন, এনজিও, শিক্ষা এবং কারিগরী ইনস্টিটিউট, বেসরকারী সেক্টর এবং দাতা সংস্থা) মধ্যে সমন্বয় করে কৌশলগত, বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবা পার্টনারশীপ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারের কাজ হচ্ছে ঝুঁকি হ্রাস এবং সার্বিক দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা যা জাতীয় নীতি এবং কার্যক্রমের প্রধান ফোকাস পরিলক্ষিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৩.২.১.১২ প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী

সরকারী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজ সেবা বিভাগ প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় এ্যাকশান প্ল্যান তৈরী ক হয়েছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বেশ কিছু নীতি প্রণয়ন করেছে যেমন, জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতি ১৯৯৫। এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন এবং তাদের সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ। একই সঙ্গে এ্যাকশান প্ল্যান তৈরী করে নীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন এবং তাদের সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে,

১। প্রতিবন্ধীদের সহজে টিকেট প্রাপ্তির জন্য রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, নদী বন্দর, ষ্টিমার টার্মিনাল এবং এয়ারপোর্টে পৃথ কাউন্টার স্থাপন করা।
২। প্রতিবন্ধীদের জন্য বাস, ট্রেন এবং জলযানে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা।
৩। সরকারী চাকুরীতে এতিম এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য পদ সংরক্ষিত রাখা।
৪। প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতি সরকারী ভবনে র‍্যাম্প তৈরী করা।
৫। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যমান বাধাও দূর করা হবে।
৬। সকল সরকারী এবং বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে প্রতিবন্ধীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা

প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজ সেবা মন্ত্রণালয় সমন্বয় করছে। সরকরী নীতিতে অটিজ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অটিজম বিষয়ে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষত অটিজম শিশুদের সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২.১.১৩ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ১৯৯৩

জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) এর উদ্দেশ্য ইমারতের নক্সা, নির্মাণ, নির্মাণ সামগ্রীর মান, ইমারত ব্যবহারকারী ও ব্যবহা ইমারতের অবস্থান এবং রক্ষনাবেক্ষণ যেন এমন মানের হয় যাতে জীবন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সম্পত্তি এবং জন নিরাপত্তা সাধ্যমত নিশ্চি করা যায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে জন নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্য, ইমারত নির্মাণ, পূণনির্মাণ, মেরামত, অপসারণ, ব্যবহার বা ব্যবহারকারী কারণে, আগুন লাগার কারণে, আলো বাতাস বা সেনিটেশনের অভাব ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বিল্ডিং কোডে ইমারতের প্রধান বিষয় যেমন, অগ্নি নির্বাপণ, নির্মাণ সামগ্রী, ইমারতের কাঠামো ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা এ ইমারতের সার্ভিস ইত্যাদি বিষয়ে মান নির্ধারণ ও সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া কোডে ঐতিহাসিক ইমারত সংরক্ষণের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। বিল্ডিং কোড ১৯৯৩ সালে প্রণীত হলেও ২০০৮ সালে তা আইনে পরিণত করা হয়।

পর্যালোচনা

বিল্ডিং কোড আইন প্রণীত হলেও এর প্রয়োগ বর্তমানে শুধু দেশের বড় বড় শহরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে জন সচেতনতার যথেষ্ট অভাব আছে।

৩.২.১.১৪ ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২

নির্দিষ্ট এলাকার পরিকল্পনা প্রনয়নের স্বার্থে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ এবং পুকুর কাটা প্রতিরোধের জন্য ১৯৫২ সালে এই আইন পাশ করা হয়। তবে আইনটি যে সমস্ত শহরে নগর স্থানীয় সরকার আছে শুধু মাত্র ঐ সমস্ত শহরে প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই আইনে ইমারত নির্মাণের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন

আইনে ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যানে ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার জোনিং প্রদর্শণ করা হয়। উল্লেখিত ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী প্রস্তাবিত ইমারতের নক্সা অনুমোদন করা হয়।

ইমারত নির্মাণ বিধি

ইমারত নির্মাণ আইনের ১৮ ধারায় ইমারত নির্মাণ বিধি দেয়া আছে, যার অধীনে ইমারতের নক্সা অনুমোদন করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ বিধি তৈরী করা হয় ১৯৯৬ সালে। ইমারত নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সমস্যার জন্য ২০০৮ সালে ঢাকা শহরের জন্য পৃথক বিধি তৈরী করা হয়।

নির্মাণ অপসারণের ক্ষমতা (ধারা ৩বি)

ইমারত নির্মাণ আইনে নক্সা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে অবৈধ নির্মাণ অপসারণের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত নক্সা লংঘণ করে ভবন নির্মাণ করলে কর্তৃপক্ষ ঐ ভবন ভেঙে ফেলার ক্ষমতা রাখে।

পাহাড় কর্তণে নিষেধাজ্ঞা (ধারা ৩সি)

আইনের ৩সি ধারায় পূর্ব অনুমোদন ছাড়া সকল ধরনের পাহাড় কাটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অবৈধ নির্মাণ অপসারণ (ধারা ৭)

নক্সা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে ধারা ৭ বলে ইমারত নির্মাণ বিধি লংঘন করে নির্মিত ইমারত অপসারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে ইমারতের মালিককে তার অবৈধ ইমারত অপসারণের নির্দেশ প্রদান করা হবে। মালিক তাতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ এই আইন বলে নিজে তা অপসারণ করবে এবং মালিকের কাছ থেকে এই অপসারণ কাজের সকল ব্যয় পুনরুদ্ধার করবে।

আপিল

তবে আইনে কর্তৃপক্ষের যে কোন পদক্ষেপের বিষয়ে আপিল করার বিধান আইনে রাখা হয়েছে।

পর্যালোচনা

১। মাস্টার প্ল্যান জোনিং করার প্রধান উদ্দেশ্য নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু অধিকাংশ শহরের কোন মাস্টার প্ল্যান নাই। এটি ঐ সমস্ত শহরের নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত করছে।
২। নির্দেশদানকারীদের বিধি লংঘন মনিটরিংএর ক্ষেত্রে প্রকট অবহেলা রয়েছে।
৩। অধিকাংশে বাড়ীর মালিক অনুমোদন কর্তৃপক্ষের বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে নক্সা অনুমোদন করে না।
৪। সরকারী ইমারত নির্মাণে, ইমারত নির্মাণ বিধি অনুসরণ করে না, যা বৈধ নয়।

৩.৩ জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা সমূহের সাথে সিলেট মাস্টার প্ল্যানের সম্পর্ক

বিদ্যমান পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না। বর্তমা উন্নয়ন বাজেটে যে সম্পদ বন্টন করা হয় তা একটি টপ-ডাউন পদ্ধতি যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। প্রকৃ প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে দুর্বলভাবে শুধুমাত্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন করা হয়। ফলে স্থানীয় জনসাধারণে প্রয়োজন এবং আশা আকাঙ্খার প্রকৃত প্রতিফলন জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাগুলোতে পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহা করে সরকারী দলের স্থানীয় নেতারা নিজেদের খেয়ালমত পরিকল্পনা করেন যাতে জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা প্রয়োজনে প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার একটি সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন যাতে স্থানীয় জনসাধারণে আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন "বটম-আপ" পদ্ধতি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের পরাম মোতাবেক বাজেট বন্টন।

এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন ক্ষে অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবকাঠামো এবং সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন এব স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। এর মাধ্যমে এলাকায় নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং এতে কর্মসংস্থা বাড়বে। ফলশ্রুতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তা দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে যা পিআরএসপি এর অন্যত প্রধান উদ্দেশ্য। মাস্টার প্ল্যানে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প, বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এব এটি সরাসরি দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় তথা জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এর মাধ্যমে শহরের বাইরে থে কাজের সন্ধানে আসা লোকজনদের গ্রহণ করা শহরের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

৪.১ অবকাঠামোগত সেবা সুবিধা

কৌশলগত পর্যায়ে (Strategic Level) সিলেট শহরের কোন অবকাঠামোগত সুবিধাই সন্তোষজনক পাওয়া যায় নাই। শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় যার ফলে বর্ষাকালে শহরের জলাবদ্ধতা জটিল আকার ধারণ করে। শহরে পর্যাপ্ত, মান সম্মত চওড়া এবং সুষ্ঠু সংযোগ রাস্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সারা দেশের মত এখানেও বিদ্যুৎ সমস্যা মানুষের দুর্ভোগের কারণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। শহরের বহু সংখ্যক মানুষ আর্থিক সঙ্গতির অভাবে গ্যাস সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রতিনিয়ত যে হারে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অদুর ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ পানি নিঃশেষ হয়ে পানির সংকট দেখা দিতে পারে।

সিলেট শহরের অবকাঠামোগত প্রধান উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে- যাতায়াত ব্যবস্থা, জ্বালানী ও পানি সরবরাহ। যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। শহরবাসী প্রাত্যহিক জীবনে দুই ধরনের জ্বালানী ব্যবহার করে থাকে-বিদ্যুৎ এবং গ্যাস।

৪.২ নগরায়ন এবং জনসংখ্যা

সিলেট শহরে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরের ভৌগলিক আয়তনও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। **সারণি-৪.১** এ ১৯০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনসংখ্যা ও তার প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

সারণি-৪.১: ১৯০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনসংখ্যা ও তার প্রবৃদ্ধি

আদমশুমারী সাল	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯০১	১৩,৮৯৩	-
১৯১১	১৪,৪৫৭	০.৩৯
১৯২১	১৬,৯১২	১.৫৮
১৯৩১	২১,৪৫৫	২.৪
১৯৪১	২৮,১২৮	২.৭৫
১৯৫১	৩৩,১২৪	১.৬৫
১৯৬১	৪০,৬৪৪	২.০৭
১৯৭৪	৬৩,৪১৭	৩.৫
১৯৮১	৮৭,৯২২	৮.৪
১৯৯১	১,১৭,৩৯৬	২.৯৩
*২০০১	২,৬২,৮৯৯	৮.৪
**২০০৬	৩,৯৩,৪৯১	৮.৪
**২০১০	৫,৪৩,৩১৬	৮.৪ (এসসিসি এলাকা) ৪.৩৫ (সম্প্রসারিত এলাকা)

উৎস: বিবিএস, কনসালট্যান্ট কর্তৃক অভিক্ষেপকৃত ; বি.দ্র. * পৌর এলাকা ** অভিক্ষেপকৃত

প্রকল্পের সীমানা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত- সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত সংলগ্ন সম্প্রসারিত এলাকা। এই দুটি এলাকার জনসংখ্যা ঘনত্বে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্যণীয় (সারণি-৪.২)। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গড় জনসংখ্যা ঘনত্ব একরপ্রতি ৮০ জন, পক্ষান্তরে সম্প্রসারিত এলাকায় গড় জনসংখ্যা ঘনত্ব একরপ্রতি মাত্র ৭ জন। আদমশুমারীর (২০০১) তথ্য থেকে ২০১০ সালের জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার ২০১০ সালের জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে একর প্রতি ২৫ জন (৬১২২ জন প্রতি বর্গ কিঃমিঃ)। সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এই হার একরপ্রতি ৬০ জন (১৬২৯৬ জন প্রতি বর্গ কিঃমিঃ)। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধি হিসাব করা হয়েছে ৫১ শতাংশ।

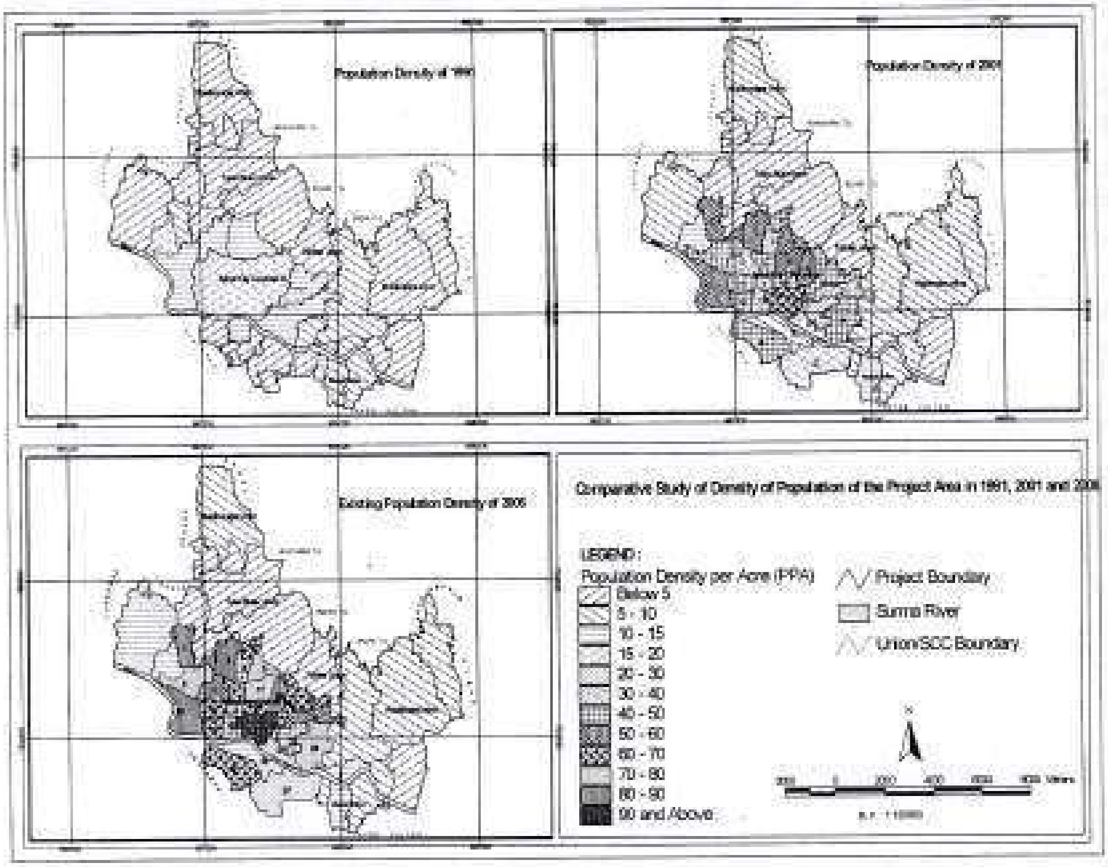

চিত্র-৪.১: ১৯৯১,২০০১ ও ২০০৬ সালে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব পরিবর্তন।

অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বেশি থাকায় স্বাভাবিক কারণে সিটি কর্পোরেশন এর কেন্দ্রীয় এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের ১৪ ও ১৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ঘনত্ব (একরপ্রতি ৯৫ জন) পাওয়া গিয়েছে এবং এ দুটো ওয়ার্ডই শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত। পরবর্তী সর্বোচ্চ ঘনত্ব পাওয়া গিয়েছে ৭, ৮, ১০ এবং ১৮ ওয়ার্ডে । এগুলোতে জনসংখ্যা ঘনত্ব একরপ্রতি ৬১ থেকে ৮০ জন। ওয়ার্ড নং ২,৪,১৩ এবং ২২ এর ঘনত্ব মধ্যম পর্যায়ের। সর্বনিম্ন জনসংখ্যা ঘনত্ব রয়েছে ওয়ার্ড নং-২৬ এ। এখানে প্রতি একরে ১২ জন বসবাস করে। সুরমা নদীর তীরবর্তী এই ওয়ার্ডে রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল এবং পাইকারী বাজার অবস্থিত। লক্ষ্যণীয় যে, নগরপ্রান্ত এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রসারিত এলাকায় সর্বোচ্চ ঘনত্ব (একর প্রতি ১৪ জন) পাওয়া গিয়েছে কসবা আখালিয়া এলাকায়। এখানে শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। উত্তরদিকে চা বাগান এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব সর্ব নিম্ন (একরপ্রতি ১-৪ জন)। সিটি কর্পোরেশন ও সম্প্রসারিত এলাকায় ১৯৯১, ২০০১ ও ২০০৬ সালের জনসংখ্যা ঘনত্বে একটি তুলনামূলক চিত্র **সারণি-৪.২** এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৪.২: পরিকল্পনা এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব

এলাকা	এলাকার আয়তন (একরে)	১৯৯১	২০০১	২০০৬	২০১০
		জন/একরপ্রতি	জন/একরপ্রতি	জন/একরপ্রতি	জন/একরপ্রতি
সিটি কর্পোরেশন	৬৭৫১.৫৭	১৭	৩৯	৫৮	৮০
সম্প্রসারিত এলাকা	১৪২৮৮.১৬	৩	৫	৬	৭
মোট/গড়	২১০৩৯.৭৫	৮	১৬	২৩	৩১

৪.৩ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান

৪.৩.১ অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ চিত্র

সিলেট শহরকে রেমিটেন্স শহর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কারণ এই শহরের অধিবাসীরা প্রবাসী সিলেটীদের কাছ থেকে প্রচুর রেমিটেন্স পেয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে শহরের শতকরা প্রায় ১২টি পরিবার প্রবাসী সিলেটীদের কাছ থেকে মাসে মাসে রেমিটেন্স পেয়ে থাকে। সিলেট শহর হচ্ছে সিলেট অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র। মূলত রেমিটেন্সের কারণে এখানে ব্যবসা বানিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করছে। ঐতিহাসিকভাবে সিলেটের সঙ্গে বহির্জগতের সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। সিলেট তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক। যদিও শিল্পের দিক দিয়ে সিলেট যথেষ্ট অগ্রসর নয়, তবুও শিল্পায়নে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরই সিলেটের অবস্থান। সিলেটের পর্যটন শিল্প যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। হযরত শাহ জালাল (রহঃ) ও তাঁর ৩৬০ জন আউলিয়ার মাজার থাকার কারণে সিলেটকে পবিত্র শহরও বলা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রতিদিন শহস্রাধিক ভক্ত এ সমস্ত মাজার জিয়ারত করে থাকেন। শহরে উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সবুজ পাহাড় ও তার পাদদেশে অবস্থিত চা বাগানগুলো শহরকে এক অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত করেছে এবং শহরের গুরুত্বও প্রভূত বৃদ্ধি করেছে।

সিলেট শহরে অবস্থিত বাজারগুলো শহরের অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। সিলেট শহরে নির্মাণ শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। শহরে প্রচুর এ্যাপার্টমেন্ট, হোটেল ও শপিং মল নির্মিত হচ্ছে। মূলত ভোগ্যপণ্য ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে সিলেট শহরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। সিলেট জেলা বিসিক দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সিলেট শহর ও এর আশেপাশে আনুমানিক ২৬৬১টি বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। এর মধ্যে আছে চালকল, বেকারী, প্রেস, বিভিন্ন ধরণের মেরামত কারখানা, ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি। শহরের আর্থ-সামাজিক জরিপ (২০১০) থেকে দেখা যায় যে ৩৭% উপার্জনকারী উত্তরদাতার আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে ব্যবসা। শহরের অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক তৎপরতায় নিয়োজিত আছে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ যা এই শ্রেণীর মানুষের বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিভাগীয় শহর ও সিটি কর্পোরেশন হওয়ার কারণে এখানে অনেক সরকারী দপ্তর রয়েছে এবং এগুলো প্রচুর কর্মসংস্থানের উৎস। সারণি-৪.৩ এ সিলেট শহরে কর্মসংস্থানের চিত্র দেখানো হয়েছে।

সারণি-৪.৩: সিলেট শহরে কর্মসংস্থানের চিত্র (হিসাবকৃত)

উপার্জনের খাত	কর্মসংস্থানের উৎস	বর্তমানে নিয়োজিত সংখ্যা	% হার
ব্যবসা	- বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা - আত্মকর্মসংস্থান - বিভিন্ন ধরণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস	৪৫০০০	২৪.৯৩
যানবাহন	- রিক্সা/ভ্যান/ঠেলা গাড়ী - টাউন সার্ভিস বাস - টেম্পো/লেগুনা/সিএনজি - মাইক্রোবাস/মিনিবাস/বাস/ট্রাক/কার/অন্যান্য	৪০০০০	২২.১৬
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	- প্রসাশনিক/শিক্ষা/স্বাস্থ্য/ব্যাংক,ইত্যাদি - বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/সরকারী - আধা-সরকারী সংস্থা	২০০০০	১১.০৮
বেসরকারী চাকুরী	- বেসরকারী ব্যবসা/এনজিও/টি এষ্টেট	১৫০০০	৮.৩১
শিল্প-কারখানা	- বিসিক শিল্প এলাকা - এসএমই সেক্টর	১১৩৬০ ১৬১২৫	১৫.২২
নির্মাণ	- হাউজিং এষ্টেট, - সর্ব প্রকার ইমারত নির্মাণ - ব্রিক ফিল্ড	১৮০০০	৯.৯৭
অনানুষ্ঠানিক শ্রম	- দিন মজুরী	৫০০০	২.৭৭
অন্যান্য		১০০০০	৫.৫৪
মোট		১৮০৪৮৫	১০০.০০

উৎস: সংগৃহীত তথ্য থেকে হিসাবকৃত

শহরের মানুষের শতকরা প্রায় ৬১ জন কর্মক্ষম (১৫ থেকে ৫৯ বৎসর), যদিও এদের মধ্যে মাত্র ৩৩% জন অর্থনৈতিকভাবে নিয়োজিত আছেন। শহরের ৩৯% মানুষ নির্ভরশীল অর্থাৎ হয় শিশু অথবা কর্মে অক্ষম বৃদ্ধ। সিলেট শহরের পরিবারগুলির গড় মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা। জরিপ থেকে দেখা যায় প্রায় ২৬% মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। এদের মাসিক আয় ৫৫০০ টাকা বা তার কম। অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের হার দেশের গড় দারিদ্র হারের (৪০%) তুলনায় কম।

সিলেট শহরের সমস্যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যান্য শহরের মতই। এখানে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের আধিক্য রয়েছে। এদের যথেষ্ট কর্মসংস্থান ও আয় না থাকায় ভোগ্যপণ্যের বাজার ধীর গতিতে সমপ্রসারিত হচ্ছে । এই প্রবণতা বিনিয়োগ কারীদের আকৃষ্ট করার মত যথেষ্ট আকর্ষনীয় নয়। বিনিয়োগ পরিবেশ যথেষ্ট অনুকূল না থাকায় রেমিটেন্সের অর্থ হয় ব্যাংকে পড়ে থাকছে অথবা অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে সিলেটে বেসিক শিল্প গড়ে উঠছে না। প্রবাসীরা এখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকায় তারা বিনিয়োগের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এতদসত্ত্বেও সিলেটে এখনো বিনিয়োগ সম্ভাবনা ব্যাপক এবং পর্যাপ্ত বিনিয়োগ হলে সিলেট অঞ্চল জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

৪.৩.২ বাজার ও বিপনন সুবিধা

বাজার ও বিক্রয়কেন্দ্রগুলো সিলেট শহরের অর্থনৈতিক তৎপরতার মূল কেন্দ্রবিন্দু। এখানে গুরুত্ব ও বিশেষত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন আয়তনের প্রায় ৩০ টি ছোট বড় বাজার আছে। এর মধ্যে কদমতলী মার্কেট ফলের পাইকারী বাজার হিসাবে বিখ্যাত। এখানে দেশ বিদেশ থেকে ফল আমদানী ও কেনা বেচা হয়। এখানে প্রায় ৫০টি পাকা দোকান আছে এবং প্রতিদিন ৫০-৬০টি পিক আপ ভ্যানে আসা ফল ক্রয় বিক্রয় হয়। স্থানীয় উৎস থেকে জানা যায় যে এখানে প্রতিদিন প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ফল কেনা বেচা হয়।

শহরে হাজী নোয়াব আলী মার্কেট ও সিলেট ট্রেড সেন্টার নামে দুটো পাইকারী শব্জির বাজার আছে। দুটো বাজারে দোকানের সংখ্যা প্রায় ২৫০ টি। বাজার দুটোতে প্রতিদিন প্রায় ২৫০ মেট্রিক টন শব্জি কেনা বেচা হয় যার বাজার মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

কালীঘাট বাজারে প্রধানত চাল পাইকারী কেনা বেচা হয়। এখানে উত্তরাঞ্চল থেকে প্রতিদিন ২৫০ মেট্রিক টন চাল আসে। এছাড়া এখানে আলু, আদা, পেয়াজ, রসুন ইত্যাদিও কেনা বেচা হয়। এই বাজারে প্রতিদিন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মালামাল লেন দেন হয়।

কাজীর বাজার নামে শহরে একটি মাছের পাইকারী বাজার আছে। এখানে প্রতিদিন ৪৫ থেকে ৫০ ট্রাক মাছ কেনা বেচা হয়। এখানে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওড় এলাকা থেকে মাছ আমদানী করা হয় ।

আশির দশকে সিলেট শহরে হাতে গোনা কয়েকটি শপিং সেন্টার ছিল। বর্তমানে সেখানে ব্যাপক সংখ্যক শপিং মল গড়ে উঠছে। লন্ডন ম্যানসন, মিলেনিয়াম শপিং সিটি, জাতীয় আধুনিক শপিং সেন্টারগুলো প্রবাসী সিলেটী ও স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে লক্ষ্য করে নির্মাণ করা হয়েছে।

সিলেট শহরে প্রায় ৩ লক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য মাত্র ২২ টি ছোট বড় কাঁচা বাজার আছে। কিন্তু বাজারগুলো সুষমভাবে শহর জুড়ে ব্যাপৃত নয়। অধিকাংশ বাজার শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত। আবার কিছু বাজার ফুটপাথ দখল করে গড়ে উঠেছে। বাজার ছাড়াও সিলেটে বড় রাস্তার ধারে অপ্রাতিষ্ঠানিক দোকানপাট আছে যা মূলত শহরের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের উপার্জনের উৎস।

বিদেশ থেকে ব্যাপক হারে রেমিটেন্স আসার ফলে সিলেট শহরের ভোগ্যপণ্যের বাজার ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারী আনুকূল্যে এ অঞ্চলে একটি স্পেশিয়াল ইকোনোমিকজোন (Special Economic Zone) গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। এটি সম্ভব হলে সিলেটে শিল্প কাঠামো গড়ে উঠতে পারে, যা সিলেটের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে। এর ইতিবাচক ফলাফল সামগ্রিকভাবে সমগ্র সিলেট অঞ্চলে পড়বে।

[illegible] পরিবহন ব্যবস্থা

[illegible] বিদ্যমান পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

[illegible] দেশের সঙ্গে সিলেটের অত্যন্ত ভালো সড়ক, রেল, অভ্যন্তরীণ নৌ ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। সুরমা নদীর তীরবর্তী [illegible] নৌ যোগাযোগের কারণে প্রাচীনকাল থেকে সিলেট শহরের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য চালু ছিল। কিন্তু সুরমা নদী [illegible] নৌ চলাচলের উপযোগী না থাকায় নৌ পথে যাতায়ত অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে।

[illegible] ও চট্টগ্রামের সঙ্গে সিলেটের ভালো রেল ও সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। ওসমানী বিমান বন্দর এখন দেশের তৃতীয় আন্ত [illegible] বিমান বন্দর। নতুন ও উন্নত সড়ক নির্মাণের ফলে এখন ঢাকা ও সিলেটের মধ্যে যাতায়ত সময় ৭/৮ ঘন্টা থেকে ৪/৫ [illegible] নেমে এসেছে। নব নির্মিত সিলেট-জাফলং সড়ক এ অঞ্চলের পর্যটন ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করেছে। [illegible] বাইপাস সড়ক সিলেট শহরে যানজট কমাতে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

[illegible] সড়ক ও ভালো বাস সার্ভিস চালু হওয়ায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক উন্নত। যার [illegible] সড়ক পথে সর্বাধিক পরিমান যাত্রী (৯০%) চলাচল করছে ও মালামাল (৮৭%) পরিবহন হচ্ছে। সিলেট শহরে আনুমানিক ৩৫ [illegible] যান্ত্রিক এবং ২.৫ লক্ষ অ-যান্ত্রিক যানবাহন রয়েছে। আগামী ১০ বৎসরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

[illegible]-৪.৪: সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অবকাঠামো।

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	দৈর্ঘ্য/সংখ্যা
১.	পাকা সড়ক	৫০০ কি:মি:
২.	কাঁচা সড়ক	১৫৯ কি:মি:
৩.	পাকা ড্রেন	৬০০ কি:মি:
৪.	কাঁচা ড্রেন	৪৫০ কি:মি:
৫.	ব্রিজ	৪ টি
৬.	বক্স কালভার্ট	৫০ টি
৭.	ফুট ওভার ব্রিজ	০৫ টি

[illegible] সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭

[illegible] সড়ক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শহরের কিছু কিছু রাস্তায় যান জট একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। এই যান জটের কারণগুলোর মধ্যে [illegible] জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যান বাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, অদক্ষ যান বাহন ব্যবস্থাপনা, একই রাস্তায় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক [illegible] চলাচল, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন, ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না করা ইত্যাদি। রিক্সা শহরের সর্বাধিক ব্যবহৃত বাহন। [illegible] আছে টেম্পো, ব্যক্তিগত গাড়ী ও বেবি টেক্সি। বর্তমানে সিলেট শহরে ৩০ থেকে ৪০ হাজার রিক্সা আছে যার অধিকাংশই [illegible]। সিটি কর্পোরেশনের তালিকা অনুযায়ী বৈধ রিক্সার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। সিলেট শহরে রাস্তা পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত [illegible] পুরাতন শহর এবং নতুন শহরের কিছু এলাকায় রাস্তা অত্যন্ত সরু এবং আঁকা বাঁকা। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা ও ইমারতের সংখ্যা [illegible] রাস্তায় যাতায়াত সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি রাস্তার সংযোগস্থলের প্রশস্ততা চলাচলকারী যান বাহনের জন্য [illegible] চেয়ে কম। এই সমস্যা আম্বরখানা সংযোগস্থলে অত্যন্ত প্রকট। সিলেট শহরে অফিস ভবন, মার্কেট, আবাসিক ভবন, [illegible] প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্থানে পিক আওয়ারে পার্কিং এর স্থানগুলো যথেষ্ট [illegible] করতে পারে না। রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ীগুলো রাস্তার প্রশস্ততা কমিয়ে দেয়, ফলে যান জট দেখা দেয়।

[illegible] জরিপ থেকে দেখা যায় যে শহরের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ ১ থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে যাতায়াত করে। বন্দর [illegible] অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিপণী কেন্দ্র অবস্থিত। সুরমা নদীর উত্তরাংশের শহর এলাকায় [illegible] গ্রীড আকৃতিতে নেটওয়ার্ক তৈরী করেছে। এই গ্রীডের মধ্যে রয়েছে, কাজীর বাজার, লামা বাজার পয়েন্ট, রাজবি বাজার [illegible] বাজার পয়েন্ট, শাহী ঈদগাহ, আম্বরখানা, নয়া সড়ক, নায়ওরপুল, শাহ জালাল ব্রিজ, কীন ব্রিজ বা কোর্ট পয়েন্ট। এ [illegible] অধিকাংশ রাস্তায় প্রায় সারা দিনই যান জট লেগে থাকে, বিশেষত পিক আওয়ারে অত্যন্ত জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। [illegible] রাস্তাগুলোর প্রশস্ততা ৬ থেকে ১৫ ফুটের বেশি নয়। ফলে প্রতিনিয়ত যান জট হয়। বর্তমান পরিকল্পনার লক্ষ্য সিলেট [illegible] একটি সমন্বিত, দক্ষ ও ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা পরিবেশ বান্ধব, গ্রহণযোগ্য এবং শহরের ভবিষ্যত

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায় হবে। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা স্থানীয় সড়কগুলো বড় সমস্যা। এ সমস্ত রাস্তা নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ করা হয় না ফলে প্রতিনিয়ত জনদুর্ভোগ বেড়ে চলছে।

৪.৪.২ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যয়

শহরবাসীকে প্রতিদিন দুই ধরণের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়-নিজের বাড়ীর সঙ্গে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় সিলেটে চমৎকার যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সড়ক, রেল ও বিমান, সব ধরনের যাতায়াত সুবিধা সিলেটে রয়েছে। রাজধানীর সঙ্গে সিলেটের তিনটি পথেই চমৎকার যোগাযোগ রয়েছে। ওসমানী বিমান বন্দর দেশের তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। নিচে লং রুটে সড়ক ও রেল পথে প্রতি কিলোমিটারের ব্যয় লেখানো হলো:

- সড়ক পথে : টাকা ০.৯০ প্রতি কি:মি:
- রেল পথে : টাকা০.৭০ প্রতি কি:মি:

স্থানীয় যাতায়াতের জন্য রিক্সা সবচেয়ে জনপ্রিয় বাহন। এছাড়া টেম্পো এবং বেবি ট্যাক্সিও ব্যবহৃত হয়। এখানে বিভিন্ন ধরণের বাহনের প্রতি কিলোমিটার ভাড়ার হার দেয়া হলো:

- রিক্সা : টাকা ১০-৩০ প্রতি কি:মি:
- বেবি ট্যাক্সি : টাকা ৮.০০ প্রতি কি:মি:
- টেম্পো : টাকা ১.২০ প্রতি কি:মি:

সীমিত সংখ্যক পরিবারের ব্যক্তিগত গাড়ী রয়েছে। এরা তুলনা মূলকভাবে অবস্থাপন্ন।

৪.৫ আবাসন ব্যবস্থা

সিলেটে বর্তমানে শ্রম নির্ভর অর্থনৈতিক তৎপরতার আধিক্য থাকায় শহরে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা বেশি। এ ছাড়া রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। শ্রম বাজার ক্রমশ প্রসারিত হওয়ায় সিলেটে অন্য জেলা থেকে শ্রমজীবিদের অভিগমন বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য আবাসন সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। বিশেষত নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন সংকট প্রকট। অন্য দিকে শহরে প্রচুর এ্যাপার্টমেন্ট গড়ে উঠছে কিন্তু বাজারে তেমন চাহিদা নেই। প্রবাসীরা শহরে বিনিয়োগের আর কোন নিরাপদ ক্ষেত্র না পেয়ে রিয়েল এষ্টেট খাতে বিনিয়োগ করছে। এর ফলে শহরে জমির মূল্য গগনচুম্বী হয়ে পড়ছে (সারণি-৪.৫)। শহরের অধিকাংশ মানুষ নিম্ন আয়ের হওয়ায় তাদের পক্ষে নিজস্ব বাড়ী করা সম্ভব হচ্ছে না। বাড়ী নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব সিলেটের আবাসন সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায়। শহরের একটা বিরাট অংশে চা বাগান থাকায় পর্যাপ্ত জমির অভাব। ভূমি দস্যুরা ছড়া/খাল ও রাষ্ট্রীয় জমি দখল করে ভোগ করছে। এজন্য ঘন ঘন সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণের প্রবণতা দেখা যায়।

সারণি-৪.৫: সিলেট শহরে ডেসিমেল প্রতি জমির মূল্য (টাকায়)

এলাকা	বিদ্যমান শহর এলাকা	অব্যবহৃত/ নিচু ভূমি	টিলা /পাহাড়ী এলাকা
নগর কেন্দ্র এলাকা	১৫,০০,০০০.০০	২,৪৫,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০
আম্বরখানা	১৫, ০০,০০০.০০	২,১৫,০০০.০০	১,২৫,০০০.০০
সাদীপুর ২য় পর্ব	১২,০০,০০০.০০	১,০৫,০০০.০০	৬,৭০০.০০
রায় নগর	৮,৫০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	৮৫,০০০.০০
বাগবাড়ী	৫,০০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০	৮৫,০০০.০০
আখালিয়া	১,৫০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০
সম্প্রসারিত এলাকা	২,০০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০

উৎস: সিলেট ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, ২০০৭.

সারণি-৪.৬ এ বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন স্থানের ভূমির তুলনামূলক মূল্য দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া সিলেট শহরে ভূমির মূল্য সব চেয়ে বেশি। এ অবস্থার প্রধান কারণ সিলেট শহরে অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা অন্যান্য শহরের মানুষের চেয়ে বেশি। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মুখ্য কারণ নয়। কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে তুলনামূলক নিম্ন আয়ের মানুষ নিজস্ব আবাসনভূমির মালিক হতে পারছে না।

সারণি-৪.৬: ছয়টি বিভাগীয় শহরে তুলনামূলক জমির মূল্য

বিভাগ	ডেসিমেল প্রতি জমির গড় মূল্য (০০০)			
	পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা	কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত অপরিকল্পিত আবাসিক এলাকা	কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা	অনুন্নত নগর প্রান্ত এলাকা
ঢাকা	টা. ২১০০- টা.২৫০০ টা. ৫৪৫০০- টা.৫৭৫০	টা. ১২০০	টা. ৪৮০০- টা. ৬৬০০	টা.১৩৫০- টা. ২৫০০
চট্টগ্রাম	টা. ১২০০- টা.১৫০০ টা. ১৫০০- টা.২০০০	টা. ৫০০- টা. ৮০০	টা. ১৫০০- টা. ১৮০০	টা. ২০০- টা. ৫০০
খুলনা	টা.৩০০- টা.৪০০	টা. ৯০- টা. ১০০	টা. ১০০০- টা.১২০০	টা. ৫০- টা.৭০
রাজশাহী	টা.৩৫০- টা. ৪০০	টা. ২০০	টা. ৪৫০- টা.৫০০	টা. ২৫- টা. ৩০
বরিশাল	টা. ৩১০- টা.৩৫০	টা. ১০০- টা.৩০০	টা. ৪৭০- টা.১০৪০	টা. ২০- টা. ৬০
সিলেট	টা. ১২০০	টা. ৫০০- টা. ৮৫০	টা. ১২০০- টা. ১৫০০	টা. ৭০- টা. ১০০

উৎস- সেকেন্ডারী রেফারেন্স ও ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, সিলেট ও বরিশাল।

বাড়ীর নির্মাণ প্রকৃতি থেকে বাড়ীর মালিকের আয় এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা করা যায়। উচ্চ আয়ের মানুষ ভালো বাড়ীতে বসবাস করে এবং তার পরিবেশ ভালো হয়। সিলেট শহরের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ নিম্ন মানের বাড়ীতে বসবাস করে। এ সমস্ত বাড়ীর ভাড়া কম এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেই এবং পরিবেশ খারাপ। শহরে প্রায় ৭৫৫ টি বস্তি আছে, সেখানে শহরের প্রায় ২৭% মানুষ বসবাস করে।

আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার ৫০% লোকের নিজস্ব বাড়ী আছে। বাড়ীর মালিকানা বিষয়ক তথ্য সারণি-৪.৭ এ প্রদান করা হয়েছে। জরিপকৃত পরিবারের ৩৭% ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করে, ৪% পরিবার সরকারী বাড়ীতে বসবাস করে।

সারণি-৪.৭: বাড়ীর বসবাস সত্ত্ব

বসবাস সত্ত্ব	সিটি কর্পোরেশন এলাকা		সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকা		সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকা	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
নিজস্ব বাড়ী	১৭৫৭	৫১.৬	৪০৯	৫৯.৮২	২১৬৬	৫২.০৪
ভাড়া বাড়ী	১৩৬৮	৪০.২	১৫৫	২০.৩৯	১৫২৩	৩৬.৫৯
অতিথি বসবাসকার	১২	০.৩৫	২	০.২৬	১৪	০.৩৪
বিনা ভাড়ায়	৯৬	২.৮২	৫৬	৭.৩৭	১৫২	৩.৬৫
সরকারী কোয়ার্টার	৭০	২.০৬	৬	০.৭৯	৭৬	১.৮৩
কোম্পানী প্রদত্ত	২১	০.৬২	১০২	১৩.৪২	১২৩	২.৯৬
অন্যান্য	৭৮	২.২৯	৩০	৩.৯৫	১০৮	২.৫৯
মোট	৩৪০২	১০০.০০	৭৬০	১০০.০০	৪১৬২	১০০.০০

উৎস- কনসালটেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০০৭

অধিকাংশ বাড়ীর ছাদ টিনের। সাধারণভাবে পাকা ও সেমি পাকা উভয় ধরনের বাড়ী দেখা যায়। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪৯% এবং সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় ২৪% বাড়ী পাকা। আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭% পরিবার

কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করে। সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় এই হার ১২%। বস্তিগুলো অধিকাংশেই শহর এলাকায়, তাই শহরের বাইরে ঝুপড়ি খুব একটা দেখা যায় না। শহরের অধিকাংশ বাড়ীই এক তলা। তবে ইদানিং প্রচুর উঁচু ভবন নির্মিত হচ্ছে। থেকে দেখা যায় যে বর্তমানে বাড়ীর চাহিদা ও সরবরাহে পার্থক্য রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য শহরে প্রতি বছর প্রায় নতুন বাড়ী প্রয়োজন।

৪.৬ পরিবেশ

৪.৬.১ অতি জনঘনত্ব ও তার সমস্যা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের অন্যান্য বড় শহরের মত সিলেট শহরও ক্রমশ ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। পুশ ও পুল ফ্যাক্টরের প্রভাবে মানুষ শহরে আসছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অভাবে শহর ক্রমশ: অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে। প্রচুর মানুষ বস্তিতে বসবাস করে সেখানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। এছাড়া বস্তির সামাজিক পরিবেশ সমাজের জন্য ক্ষতিকারক।

৪.৬.২ বন্যা ও নদী ভাঙ্গন

সিলেট শহর সুরমা নদীর কারণে বন্যার হুমকিতে আছে। স্বাভাবিক বর্ষায় সুরমা নদীতে ১২৬৩ m3/s পানি প্রবাহিত হয়। মৌসুমে তা ২৩ m3/s নেমে আসে। কিন্তু বন্যার সময় এটা ২৪৮০ m3/s পর্যন্ত ওঠে। সুরমা নদীর বাম তীর বরাবর ১৯৮৫ ১৪০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ করা হয়। সুরমার উভয় পাড়ে নদী ভাঙ্গন প্রবণতা আছে, কিন্তু তা চলমান নয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪.২০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ করবে।

৪.৬.৩ ভূ-কম্পন জনিত হুমকি

সিলেট অঞ্চলের অবস্থান বাংলাদেশের ৩ নম্বর ভূমিকম্প জোনে অবস্থিত এবং এই জোন সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল। সুতরাং সিলেট শহর অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মধ্যে অবস্থান করছে। এ অঞ্চলে শেষ বড়মাত্রার ভূমিকম্পের পর প্রায় ১০০ বছর পার গিয়েছে। তাই এখানে বড় ধরনের ভূমিকম্পের সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ডাউকি ফল্ট জোন, শাহবাজপুর জোন এবং ত্রিপুরা-আসাম ফল্ট জোন বর্তমানে খুবই সক্রিয় এবং শক্তি সঞ্চয় করছে। যে কোন সময় একটি প্রবল ভূমিকম্প অঞ্চলে আঘাত হানতে পারে। সিলেটের অবস্থান অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় হলেও এখানকার বাড়ীঘর নির্মাণে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। ফলে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে ব্যাপক ধংসযজ্ঞ ঘটে যেতে পারে। এ জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা জরুরী।

৪.৬.৪ টিপাইমুখ বাঁধের জন্য আশঙ্কা

সীমান্তের ওপারে ভারতের মনিপুরে বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ এলাকায় বাঁধ নির্মাণের জন্য ভারত সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রস্তাবিত এই বাঁধ সরাসরি সিলেট শহরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। উজানে একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ফলে গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা বাড়বে। এতে শহরে কর্মপ্রত্যাশী অভিগমনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শহরে বস্তির সংখ্যা বাড়বে ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুরমা ও কুশিয়ারায় প্রবাহ কমে যাওয়ায় নৌ চলাচল ব্যাহত হবে, যা অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার ওপর সরাসরি আঘাত হানবে। নদীতে পানি কমে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাবে। ফলে সেচ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পানযোগ্য পানির অভাব দেখা দেবে। নদীতে মাছ কমে যাবে এবং বৃক্ষরাজী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পানির স্বল্পতায় নদীতে চর পড়বে এবং নাব্যতা কমে যাবে। বর্ষায় উজানের পানি ব্যাপকভাবে অবমুক্ত করা হবে। এতে সুরমা-কুশিয়ারা নদীতে পানি বৃদ্ধি পাবে এবং এ অঞ্চলে বন্যা দেখা দেবে।

৪.৬.৫ পানি নিষ্কাশন সমস্যা

ছয়টি বড় খাল এবং নয়টি ছড়ার মাধ্যমে সিলেট শহর ও তার আশে পাশের এলাকার পানি নিষ্কাশিত হয়। এসমস্ত প্রবাহ বৃষ্টির পানি ছাড়াও শহরের বর্জ্য পানি অপসারণ করে থাকে। এ সমস্ত পানি পরিশোধন ছাড়াই সুরমা নদীতে নিষ্কাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে গোয়ালী ছড়া এবং কাজীর হাট ছড়া প্রধান।

জলাবদ্ধতা সিলেট শহরের একটি অতি সাধারণ সমস্যা। সামান্য বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকে। জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ পানি নিষ্কাশন চ্যানেলগুলো সঙ্কুচিত অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এগুলো এক সময় শহরের প্রাণ ছিল। কিন্তু কালক্রমে জমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে এগুলো দখল হতে হতে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। এর ফলে এগুলো দিয়ে আগের মত পানি প্রবাহিত হয় না। যে কারণে সামান্য বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। শহরে অপরিকল্পিত উন্নয়ন এর জন্য দায়ী। কোন কোন স্থানে প্রাকৃতিক খাল সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। দশ বছর পূর্বেও সিলেট শহরে ছোট বড় ১৭ টি পুকুর ছিল, যে গুলো প্রচুর বৃষ্টির পানি ধারণ করতো। এখন পুকুরগুলোর অধিকাংশই ভরাট হয়ে গিয়েছে। অতি সম্প্রতি শহরের আশে পাশের বেশ কিছু আবাসিক প্রকল্প উন্নয়নের জন্য প্রায় ২.৬৮ ব: কি: নিচু এলাকা ভরাট করা হয়েছে।

যেখানে সেখানে ফেলে দেয়া বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে প্রবাহিত হয়ে রাস্তার পাশের ড্রেনে পড়ে। ফলে একদিকে এগুলো ড্রেন বন্ধ করে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে, অন্য দিকে পরিবেশ দূষণ ঘটায়। সিটি কর্পোরেশনের সীমিত সম্পদ দ্বারা সব সময় ড্রেন পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না। বস্তি এলাকায় অনেক বাড়ীর মনুষ্য বর্জ্য সরাসরি ড্রেনে ফেলা হয়, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকী স্বরূপ। বর্ষায় সুরমা নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরের পানি খাল দিয়ে নদীতে ফেলা সম্ভব হয় না। এটাও জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে ৬৩% পরিবারের বাড়ীতে নিজস্ব ড্রেন আছে, ৩৯% বাড়ীর ড্রেন বাইরের ড্রেনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কিন্তু ৬৩.৪০% পরিবারের মতামত হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশনের ড্রেন ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়।

৪.৭ সামাজিক ও কমিউনিটি সেবাসুবিধা

৪.৭.১ শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে শহরে ৭ বৎসরের উর্ধে জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৬৯.৭৩ শতাংশ, পক্ষান্তরে জাতীয় শিক্ষার হার প্রায় ৫২ শতাংশ। পুরুষ জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৭২.৮৫ শতাংশ এবং নারী শিক্ষার হার ৬৫.৭৬ শতাংশে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রধান কারণ শহরে অভিগমনকারীদের অধিকাংশ পূর্ব থেকেই শিক্ষিত এবং শহরে বিদ্যমান শিক্ষা সুবিধা ব্যবহার করে তারা তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলছে। জরিপ থেকে দেখা গিয়েছে যে শহরের মূল অধিবাসীদের তুলনায় অভিগমনকারীরা বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত। সিলেট শহরে প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। সারণি-৪.৮ এ বাংলাদেশ ও সিলেট অঞ্চলে শিক্ষার তুলনামূলক হার দেখানো হলো।

সারণি- ৪.৮: শিক্ষার হার (৭ বছরের উপরে), ২০০১।

এলাকা	মোট	পুরুষ	মহিলা
বাংলাদেশ	৪৫.৩	৪৯.৬	৪০.৬
সিলেট জেলা	৪৫.৪৯	৪৯.৪৩	৪১.৫৫
সিলেট সদর	৫৯.১৪	৬৩.০৯	৫৪.৬১
সিলেট পৌর কর্পোরেশন	৬৯.৭৩	৭২.৮৫	৬৫.৭৬
সন্নিহিত এলাকা	৬৬.৩	৭১.৯৫	৫৮.৩৩
গ্রাম	৪৯.৮৩	৫২.২৪	৪৬.২৬

সূত্র: বিবিএস (কমিউনিটি সিরিজ), ২০০১।

৪.৭.২ স্বাস্থ্যসেবা

শহরে উভয় ধরনের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের প্রবণতা আছে- উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও কম কার্যকর সস্তা ও বিনা মূল্যে চিকিৎসা সুবিধা। সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো সস্তায় চিকিৎসা সেবা দেয় কিন্তু তার মান ভালো নয়। পর্যাপ্ত আয় না থাকায় মানুষ উন্নত সেবা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনা। এতদসত্বেও সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা সেবার প্রধান উৎস। সিলেটে বেসরকারী খাতে চিকিৎসা সুবিধায় যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং তারা চিকিৎসা সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার আছে। সিটি কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী শহরে ৪০টি বেসরকারী ক্লিনিকে ১২০০টি বেড রয়েছে। এগুলো উচ্চ মূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে, যা সবাই গ্রহণ করতে পারে না। কিছু কিছু এনজিও

প্রতিষ্ঠানও ভালো চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। তারা এখন ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকি গুরুত্ব অনুধাবন করে।

৪.৭.৩ বিনোদন সুবিধা

ক. উন্মুক্তাঞ্চল বিনোদন

শহরে বিদ্যমান পার্ক ও খেলার মাঠ খুবই অপর্যাপ্ত। শহরে একটি মাত্র ষ্টেডিয়াম আছে, কিন্তু অধিকাংশ পাড়ায় খেলার মাঠ নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠকে স্থানীয় কমিউনিটি মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এম সি কলেজের একটি বড় মাঠ আ আম্বরখানা ওসমানী শিশু উদ্যান এবং এ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্লড শিশুদের বিনোদন চাহিদা কিছুটা মেটাচ্ছে। তবে অপ্রাতিষ্ঠানিক বিনো কেন্দ্র হিসাবে সুরমা নদীর বাঁধ নাগরিকদের খুবই প্রিয়। সিলেটে বর্তমানে প্রতি হাজারে ০.১৪ একর বিনোদনমূলক উন্মু আছে, যা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।

খ. ঘরোয়া বিনোদন সুবিধা

সিলেট শহরে একটি মিলনায়তন এবং ৭ টি সিনেমা হল আছে। এছাড়া মাঝে মাঝে কিছু এ্যামেচার গ্রুপ থিয়েটারের আয়ো করে। তবে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রধান ঘরোয়া বিনোদন হচ্ছে টেলিভিশন।

৪.৮ মিউনিসিপ্যাল সেবাসুবিধা

৪.৮.১ পানি সরবরাহ

সিটি কর্পোরেশনের প্রতিদিন ২১০০০ ঘন মিটার পানি সরবরাহের ক্ষমতা আছে, কিন্তু চাহিদা ৪৮০০০ ঘিন মিটার। প্রকৃত প সিটি কর্পোরেশন প্রতিদিন ১৬০০০ ঘন মিটার থেকে ১৮০০০ ঘন মিটার পানি সরবরাহ করে থাকে। দিনে ৮ থেকে ১০ বার বিদ্যু লোড শেডিং এর ফলে শহরে পানি সরবাহের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রেজিষ্টার্ড পা ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। সিটি কর্পোরেশন তার সরবরাহ দিয়ে মোট চাহিদার ৫০% শতাংশ পূরণ করতে পা অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ ব্যক্তিগত টিউবওয়েল, পুকুর এবং নদীর পানি দিয়ে পূরণ করা হয়। ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭ এ সি কর্পোরেশনের পানির পাইপ নেটওয়ার্ক নাই। সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে সমগ্র এলাকায় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

সিলেট শহরে পানির মূল উৎস ভূগর্ভস্থ পানি। অন্য উৎস হচ্ছে নদীর পানি। শহরে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ৯৭ টি চোপ ক রয়েছে। এছাড়া ২৭৬৫ টি হস্ত চালিত টিউব ওয়েল ও কিছু বাড়ীতে সামান্য সংখ্যা কুপ আছে। শহরে এখনো বেশ কিছু পু রয়েছে যার পানি ধোয়া মোছার কাজে ব্যবহার করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের সরবরাহকৃত পানিতে ক্ষার, ম্যাঙ্গানিজ এবং আয় রয়েছে। পানি সংরক্ষণের জন্য ৪ টি ওভার হেড ট্যাংক এবং ২ টি পানি শোধনাগার রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাই লাইনের দৈর্ঘ্য ১৬০ কি:মি: (২০০৭)। **ম্যাপ-৪.১** এ সিলেট শহরে পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক দেখানো হয়েছে। সাম্প্রতিক DPH কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হলে শহ পানি সরবরাহের কিছুটা সুব্যবস্থা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে ৪২ টি টেস্ট টিউব ওয়েল, ১৫ কি:মি: ট্রান্সমিশন মেইন লাইন ও কি:মি: ডিস্ট্রিবিউশন লাইন থাকবে।

Map : 4.1 Water Supply Network within Sylhet City Corporation Area

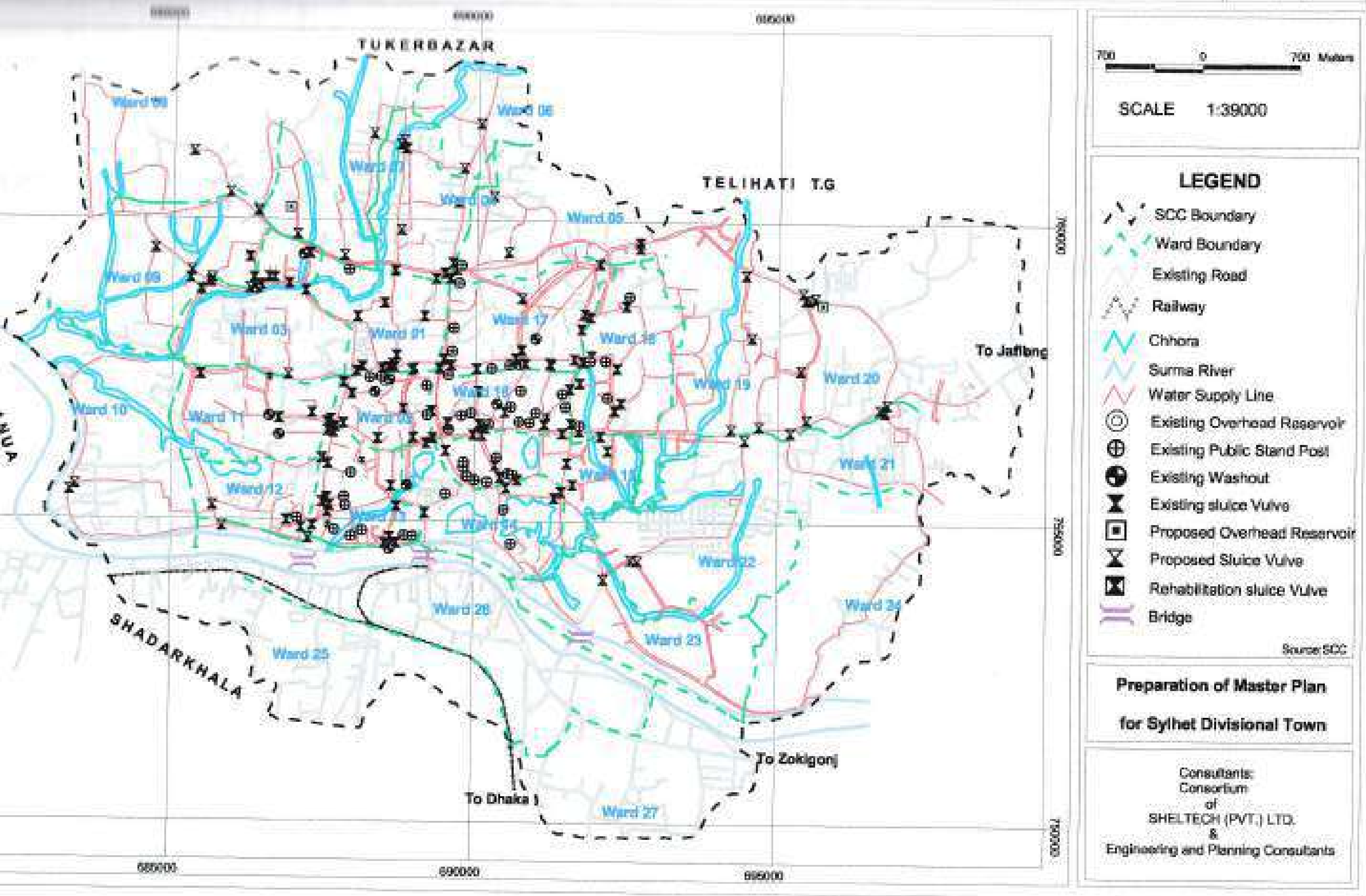

৪.৮.২ জ্বালানী

এতদঞ্চলে গ্যাস রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ৫৫৯ মিলিয়ন ঘন মিটার যা বাংলাদেশের মোট গ্যাসের প্রায় ৯৩ শতাংশ। এই গ্যাস প্রায় ২০ বৎসর ধরে তোলা যাবে। এই গ্যাসের ৩৫ শতাংশ এই অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, শহরের শতকরা ৭৭.৫৬ ভাগ পরিবার জ্বালানী হিসাবে গ্যাস ব্যবহার করে। কিন্তু অবস্থাপন্ন পরিবার গ্যাস ব্যবহার করলেও নিম্ন আয়ের পরিবার এখনো লাকড়ি ব্যবহার করছে। এদের হার প্রায় ১২ শতাংশ। শহরের বাইরে এই হার ৫৭ শতাংশ। প্রকল্প এলাকার গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্ক ম্যাপ-৪.২ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৪.৯: শহরের মৌলিক সুযোগসুবিধার প্রাপ্যতা

সুবিধাসমূহ	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকা	
	উত্তরদাতার সংখ্যা	%
বিদ্যুৎ	৩৮৭১	৯৩.০১
পৌর পানি সরবরাহ	১৬২২	৩৮.৭৩
জ্বালানী গ্যাস	৩২২৮	৭৭.৫৬
স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	৩৪১৯	৮২.১৫
বর্জ্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা	৩১৫১	৭৫.৭১
বাড়ীর কাছাকাছি বিন	৩৯৮	৯.৫৬
পাকা সংযোগ সড়ক	৩০৯৫	৭৪.৩৬

উৎস: পরামর্শকগণ কর্তৃক সম্পাদিত আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০০৭

৪.৮.৩ পয়:নিষ্কাশন

দেশের অন্যান্য শহরের মত সিলেটের পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। শহরের বিরাট সংখ্যক দরিদ্র পরিবার এখনো স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার বাইরে, ফলে ঐ সমস্ত এলাকার বসবাসযোগ্য পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগ ও কার্যক্রম খুব বেশি সাফল্য আনতে পারে নাই। এই ব্যবস্থা উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশনের যথেষ্ট সম্পদ নেই।

৪.৮.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সিলেট শহরে প্রতিদিন ১৮০ টন গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক এবং হাসপাতাল বর্জ্য সৃষ্টি হয়। সিটি কর্পোরেশন ১২০ থেকে ১৪০ টন বর্জ্য অপসারণ করতে পারে, অবশিষ্ট বর্জ্য (প্রায় ৪০%) বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরিবেশ নষ্ট করে। সিটি কর্পোরেশন প্রায়ই দিনের বেলা বর্জ্য অপসারণ করে যা দৃষ্টিকটু, জন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও কখনও কখনও রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করে। কিছু কিছু এনজিও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আখালিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে নিচু স্থানগুলোতে আবর্জনা ফেলছে, যা স্বাস্থ্য সম্মত নয়। প্রচলিত মান অনুযায়ী সিলেটের মত শহরে জনপ্রতি ০.৩০ কেজি বর্জ্য উৎপাদন হওয়ার কথা, কিন্তু উৎপাদিত হয় ০.৩৮ কেজি। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকায় এই বর্জ্যের একটা বড় অংশ অপসারণ করা সম্ভব হয় না। **সারণি-৪.১০** এ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি-৪.১০: সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধা

ক্রমিক নং	সুবিধাসমূহ	সংখ্যা
১	ট্রাক	১৫ টি
২	ট্রাক্টর	৩ টি
৩	লেবার	১৪৬ জন
৪	সুইপার	১৫৭ জন
৫	বর্জ্য সংগ্রহের স্থান (ট্রান্সফার পয়েন্ট)	১৬০-১৮০ টি
৬	ডাম্পিং সাইট	১ টি
৭	হ্যান্ড কার্ট	৭৬ টি

উৎস: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে শহরের সকল গৃহস্থালীর বর্জ্য অপসারণ। বাড়ী বাড়ী বর্জ্য সংগ্রহ করা সি
কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলা হয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এগুলো এক দি
পরিবেশ বিনষ্ট করে অন্যদিকে ড্রেন বন্ধ করে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে।

৪.৮.৫ বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ একটি দেশব্যাপী সমস্যা হলেও বিগত কয়েক বৎসরে সিলেটে এটি অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। চাহিদা
সরবরাহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে কলকারখানা সহ শিক্ষা প্রতিষ্
এবং অফিস আদালতের কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যহত হচ্ছে। সিলেট অঞ্চলে প্রায় এক কোটি মানুষ বসবাস করে এবং এই জনসং
জন্য প্রতিদিন প্রায় ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। কিন্তু সরবরাহ মাত্র ৪০ থেকে ৫০ মেগাওয়াট। যার ফলে পিডিবি
প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা লোড শেডিং করতে হয়। ম্যাপ-৪.৩ তে এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৪.১১: সিলেট শহর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা

বৎসর	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী	আমদানী *MKWH	বিক্রয় MKWH*	সংগ্রহ মূল্য MTk.**
জুলাই'০৬	১৬১০২৭	৪৬.৩৫	৩৬.৪৫	১৪১.৩০
জুন'০৭	১৯৯৬১৯	৪২.৪৮	৩৫.৪৫	১৮২.১৫

*উৎস: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭ *MKWH=Million Kilo Watt Hours, **MTk= Million Taka*

এক বছরে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৮,৫৯২ জন, কিন্তু জুলাই ২০০৭ পর্যন্ত পিডিবি বিদ্যুৎ আমদানী করেছে ৪৬.৩
MKWH। 2006 এ আমদানী ছিল ৪২.৪৮ MKWH। একইভাবে জুন ২০০৭ এ বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমান ২০০৬ এর তুলনায় কম
প্রকল্পের সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় আরইবি বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

সারণি-৪.১২: সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যুৎ অবকাঠামো

ক্রমিক নং	সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত বিদ্যুৎ অবকাঠামো	সংখ্যা
১	বিদ্যুৎ পোল	৪৪১২
২	রাস্তার লাইটের বিদ্যুৎ লাইন	৪০০ কিঃমিঃ
৩	রাস্তার লাইটের আরইবি শেড	৮৬৭
৪	রাস্তার লাইট	৪৪০৮

উৎস: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭

৪.৮.৬ টেলি যোগাযোগ

সিলেট শহরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লি. (BTCL) এর নিম্ন বর্ণিত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। বিটিএল ছাড়াও অনে
বেসরকারী টেলিফোন কোম্পানী সিলেট অঞ্চলে টেলিফোন সেবা দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পিএনটিএন কোম্পানী, পিপলসটে
র‍্যাংকসটেল, ন্যাশনাল টেল, ঢাকা ফোন, যুবক ফোন, জালালাবাদ টেলিকম ইত্যাদি। এর বাইরে সিলেট এলাকায় দেশের স
মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক আছে।

Map : 11 Existing Gas Network Map within Structure Plan Area

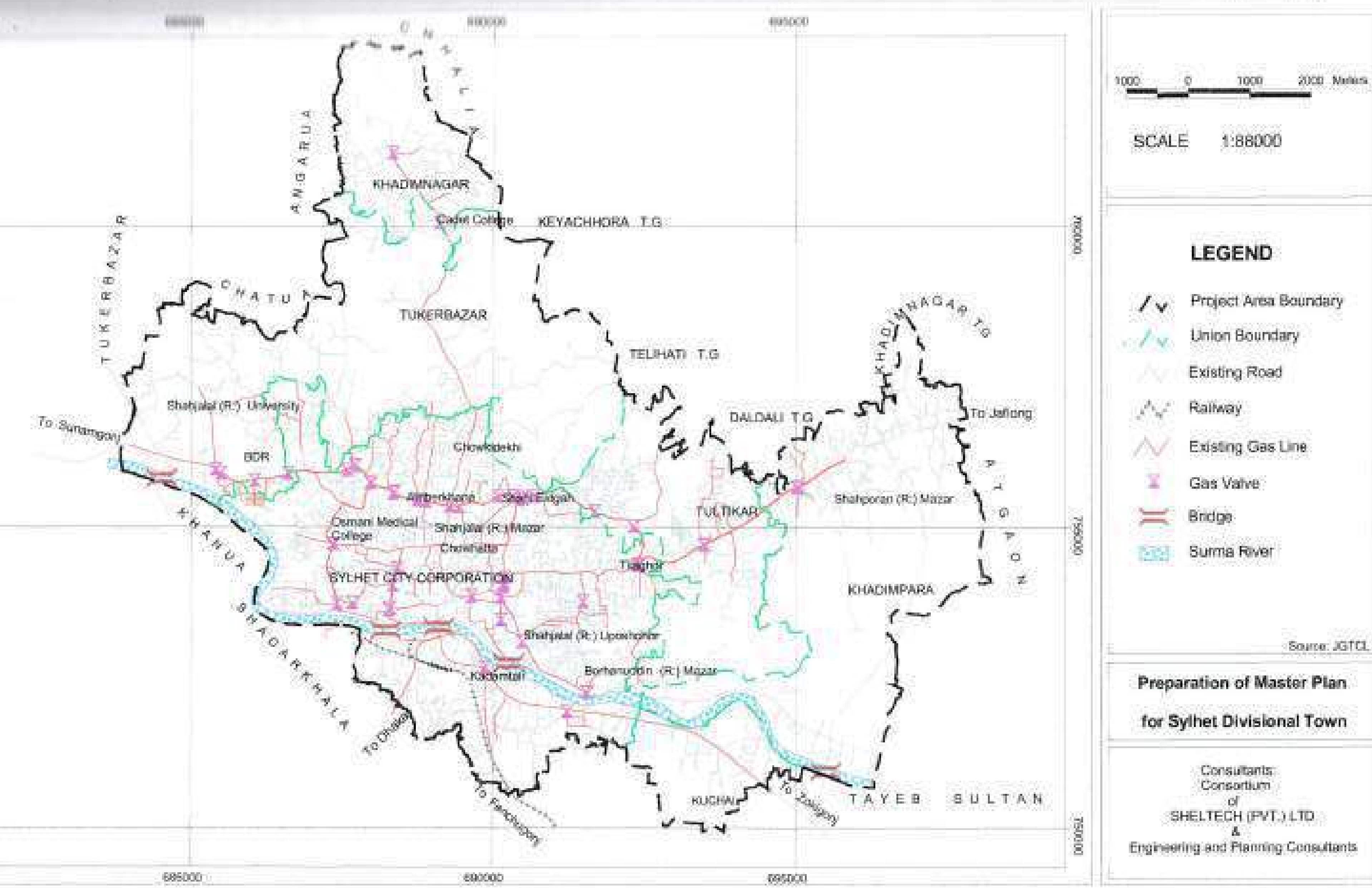

সারণি-৪.১৩: সিলেট শহরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ (BTCL) এর বর্তমান অবকাঠামো ও সুবিধাদী

এক্সচেঞ্জ এর নাম	এক্সচেঞ্জ এর ধরণ	ক্ষমতা	বরাদ্দকৃত লাইন	অপেক্ষমান আবেদন
সিলেট সেন্ট্রাল	ডিজিটাল এলকাটেল	১৫৫২৩	১৫২০৩	০
	ডিজিটাল নেটাস	৬৩৯০	৫৮২৫	০
	ডিজিটাল কেটি	৪০৯৬	৭৭৬	০
শিবগঞ্জ -আর এস ইউ	ডিজিটাল এলকাটেল	২২৮৩	২১৮৩	০
	ডিজিটাল কেটি	২৫০০	২৬৭	০
শাহ পরাণ- আর এস ইউ	ডিজিটাল কেটি	২৫০০	৪০১	০
সিলেট আলমপুর (প্রধান এক্সচেঞ্জ)	ডিজিটাল নেটাস	২০০০	১৫২৩	০
মোট		৩৫২৭২	২৬১৭৮	০

উৎস: বিটিসিএল, সিলেট, ২০০৭

৪.৮.৭ ডাক ব্যবস্থা

সিলেট শহরে একটি প্রধান ডাকঘর ও ১৫টি উপ ডাকঘর রয়েছে। কিন্তু টেলিফোন বিশেষত মোবাইল ফোন ব্যাপক বিস্তার লাভ করায় ডাক ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৪.৮.৮ অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে প্রধানত বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে। শহরের বস্তিগুলো অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য সবচেয়ে বিপদসংকুল। শহরে দুটি মাত্র অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র রয়েছে। একটি তালতলায় অন্যটি গোটাটিকারে। একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল এবং ভূমিকম্প প্রবণ শহরের জন্য বিদ্যমান অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল।

৪.৮.৯ সামাজিক নিরাপত্তা

শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের অন্যান্য শহরের মতই। সারণি-৪.১৪ এ শহরের ২০০৬ সালে অপরাধ পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরা হলো। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, শহরে নারী নির্যাতন বিষয়ক অপরাধই বেশি সংঘটিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ছয়টি থানা আছে-কোতওয়ালী, জালালপুর, আম্বরখানা, সাউথ সুরমা, শাহ পরাণ এবং মোগলাপাড়া।

সারণি-৪.১৪: সিলেট শহরে দায়ের করা অপরাধ বিষয়ক মামলা সমুহ (২০০৬)

অপরাধের ধরণ	মামলা	
	সংখ্যা	%
সন্ত্রাসী কর্মকান্ড	৩৯	৩.৭৯
খুন	১৮	১.৭৫
চুরি	৫৩	৫.১৫
নারী নির্যাতন	৬০	৫.৮৩
ডাকাতি	৬	০.৫৮
অন্যান্য	৮৫৪	৮২.৯১
মোট	১০৩০	১০০

উৎস: কোতওয়ালী থানা, সিলেট, সেপ্টেম্বর, ২০০৭

৪.৯ পর্যটক আকর্ষনীয় স্থান

পর্যটনের দিক দিয়ে সিলেট অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এখানে প্রচুর মাজার আছে। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এ অঞ্চল। আছে চা বাগানের বৈচিত্রধর্মী দর্শনীয় স্থান, ঐতিহাসিক নিদর্শন। শহর ও এর আশপাশ ছাড়াও এ অঞ্চলে প্রচুর দর্শনীয় স্থান আছে। শহর থেকে প্রায় ৫৫ কি:মি: পূর্বে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত তামাবিল এর অবস্থান। সীমান্ত অঞ্চল জাফলংএ আছে প্রাকৃতিক সৌন্দার্যের সমারোহ। প্রায় ৪৩ কি:মি: উত্তরে জৈন্তাপুরের পাহাড়ী এলাকায় আছে প্রাচীন সভ্যতার ধংসাবশেষ। ছাতকে আছে কমলা বাগান আছে। সিলেট শহরের ৪৩ কি:মি: দক্ষিণ-পূর্বে ৫ শত বৎসরের প্রাচীন সাধক শ্রী চৈতন্যের মন্দিরও রয়েছে। এতদাঞ্চলে প্রচুর পর্যটক আকৃষ্ট করার মত যথেষ্ট উপাদান রয়েছে যদি পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি ছাড়াও প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

৪.১০ জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নে সিলেটের ভূমিকা

কৃষি, বনজ ও খনিজ, পর্যটন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিলেট অঞ্চল জাতীয় উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সিলেটের গ্যাস, পাথর, বালু শিল্পায়ন ও নির্মাণ কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সিলেটের চা দেশে চায়ের চাহিদা মিটিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রারও সংস্থান করছে। প্রবাসী সিলেটবাসীর রেমিটেন্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৮.৯ বিলিয়ন ডলার, এর প্রধান একটি অংশ প্রবাসী সিলেটবাসীর অবদান। যথাযথ অবকাঠামো এবং সুযোগ সুবিধা দিলে এই অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হবে। এতে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। সিলেট বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পর্যটন শিল্পে সিলেটের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এ অঞ্চলে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের বিপুল সুযোগ রয়েছে। আরো রিসোর্ট এবং অবকাঠামো নির্মাণ করে বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যায়। এ অঞ্চলের বর্তমান উন্নয়ন ধারা খুবই আশাব্যঞ্জক। এই ধারা অব্যাহত থাকলে সিলেট এক সময় এ অঞ্চলে উন্নয়ন বিকিরণের কেন্দ্রবিন্দু হবে। দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সিলেটের বর্তমান উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখা উচিত।

৪.১১ নগর উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়

বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার ভৌত এবং আইনসম্মত কার্য পরিধি, সংস্থা সমূহের আর্থিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতার অভাব, সর্বোচ্চ পর্যায়ে কার্যকরী সমন্বয়কারী সংস্থার অভাব হচ্ছে বাংলাদেশের সামগ্রিক নগর উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়, যা থেকে সিলেটও বাদ যায় না। এখানে সিলেটের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন অন্তরায়সমূহ তুলে ধরা হলো।

৪.১১.১ সিটি কর্পোরেশনের সীমাবদ্ধতা

বিভাগীয় শহর হলেও সিলেটে কোন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংস্থা নেই। সিলেট সিটি কর্পোরেশনকেই এই কাজগুলো করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূক্ত স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার দায়িত্ব কার ? সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা প্রধান হলেও তার পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করা কতটা সম্ভব তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ সিটি কর্পোরেশন বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সংস্থার কর্মকান্ড বিকেন্দ্রীকৃত নয়। এর পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা নেই। সর্বদা সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। সংস্থার আইন কাঠামো যুগোপোযোগী নয়। ফলে জনগণের অংশ গ্রহণ বা অংশিদারীত্বমূলক কার্যক্রম স্থানীয় সরকারগুলো নিতে পারে না।

৪.১১.২ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার অভাব

যে কোন সংস্থার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা সফলতার মূল চাবিকাঠি। আর দশটি স্থানীয় সরকারের মত সিলেট সিটি কর্পোরেশনেও একই সমস্যা বিদ্যমান। তাই নগর উন্নয়নে সফলতা অর্জন করতে হলে সিটি কর্পোরেশনকে এ দুটি ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, পাশাপাশি এর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

Map : [illegible] Existing Electric Supply Network in the Project Area

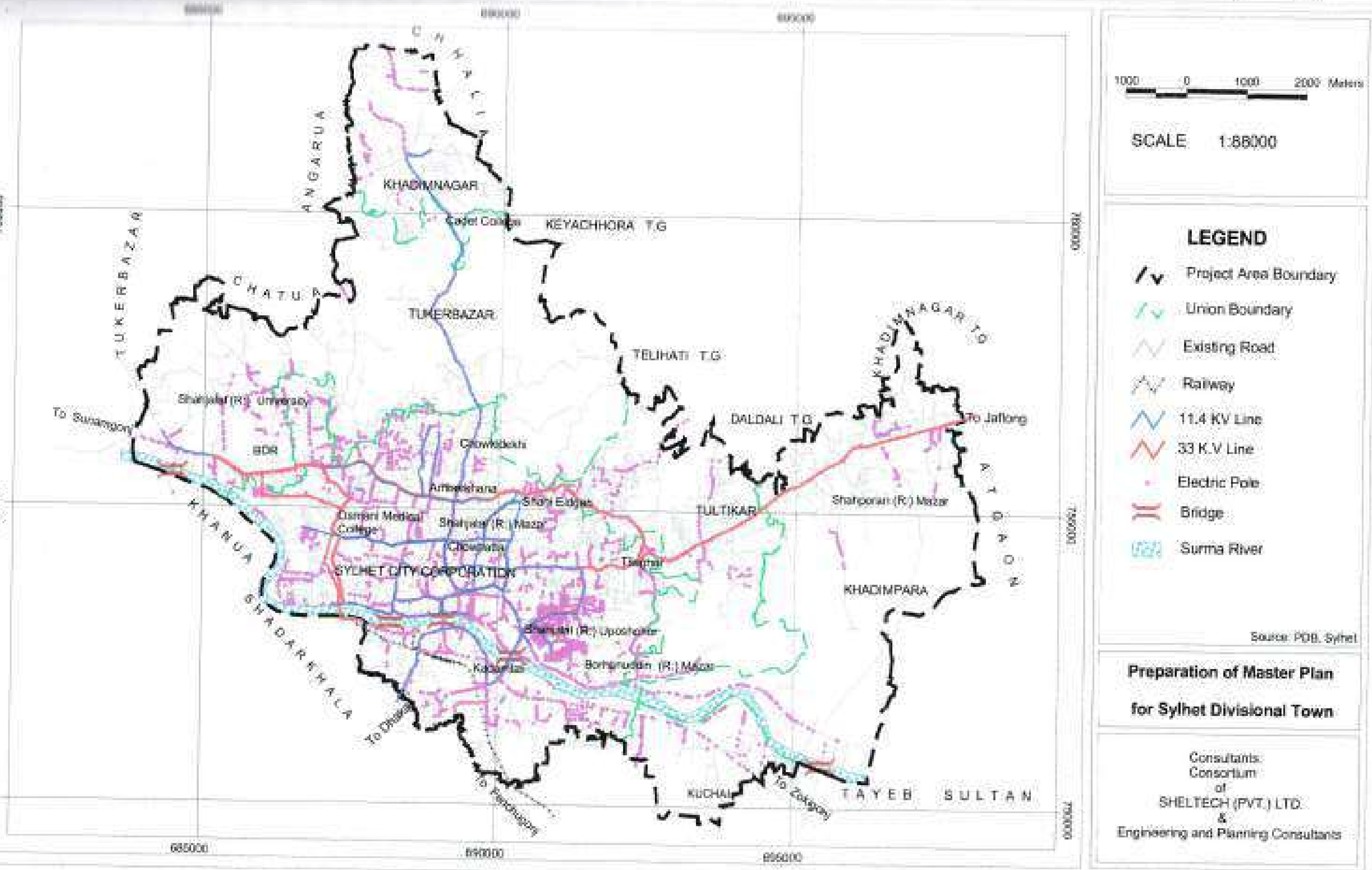

[illegible] পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

[illegible] শহরেরই কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেই। ফলে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা রূপরেখাবিহীনভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন [illegible] ইমারত নির্মাণে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কোন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নেই বিধায় ঘনবসতিপূর্ণ শহর এলাকার পরিবেশ বিনষ্ট [illegible] শহর সমস্যাবহুল হয়ে তার বাসযোগ্য পরিবেশ হারাচ্ছে। নগর উন্নয়ন এবং নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের আইন আছে কিন্তু তা [illegible] প্রয়োগ হচ্ছে না। ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন অনুযায়ী পৌর এলাকার প্রতিটি কাঠামো বা ইমারত যথাযথ [illegible] সাপেক্ষে নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু প্রতিটি শহরের বিরাট সংখ্যক কাঁচা এবং আধা-পাকা কাঠামোর কোন অনুমতি নেই। [illegible] ইমারতের ক্ষেত্রে অনেক নক্সা অনুমোদিত থাকলেও নির্মাণকালে অধিকাংশ বাড়ীর মালিক অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী তা নির্মাণ [illegible]। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সাহায্যে এলাকা ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় যাতে যত্র তত্র পরিবেশ সম্মত নয় [illegible] নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ শহরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নেই। যাদের আছে তারা এর গুরুত্ব এবং ব্যবহার [illegible] অবগত নন, ফলে তা চর্চা করা হয় না।

[illegible] রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর অনিয়ন্ত্রিত প্রসার

[illegible] ভূমির ব্যাপক চাহিদার জন্য সিলেটসহ বড় বড় শহরে প্রচুর সংখ্যক রিয়েল এস্টেট কোম্পানী গড়ে উঠছে। শহরের আবাসন [illegible] তারা অবদান রাখছে। কিন্তু এরা মূলত শহরের প্রান্ত এলাকায় স্বল্প মূল্যে নিচু ও জলা জমি কিনে তা ভরাট করে প্লট [illegible] বিক্রি করে থাকে। এরা যে সমস্ত জমি ভরাট করে দেখা যায় সে সমস্ত জমি বন্যা প্রবাহ এলাকায় অবস্থিত। এগুলো ভরাট [illegible] বন্যার আশংকা বেড়ে যাবে। অন্যদিকে দেখা যায় যে তাদের আবাসিক এলাকার উন্নয়ন অনেক ত্রুটিপূর্ণ। ব্যয় হ্রাস [illegible] ভূমির লেভেল যথেষ্ট উঁচু করা হয় না। ফলে বন্যার আশংকা থাকে। পানি, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি অবকাঠামোর সংস্থান রাখা [illegible] রাস্তার প্রশস্ততা যথেষ্ট হয় না। রাস্তা ভিন্ন অন্য কোন নাগরিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয় না। ফলে সামগ্রিকভাবে [illegible] ও প্রতারিত হন। ঢাকায় এ ধরনের রিয়েল এস্টেট নিয়ন্ত্রণের কিছু বিধি বিধান থাকলেও অন্য শহরের জন্য এধরনের [illegible] তৈরী হয় নাই।

[illegible] শিল্প কাঠামোর অভাব

[illegible] বেসিক শিল্প কারখানার অভাব রয়েছে। বেসিক শিল্প ছাড়া দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব নয়, আর শিল্পায়ন ছাড়া সমৃদ্ধ [illegible] এবং শক্তিশালী নগর অর্থনীতি গড়ে উঠবে না। বেসিক শিল্প গড়ে উঠলে পাশাপাশি প্রচুর নন বেসিক শিল্প সৃষ্টি [illegible] কর্মসংস্থান তৈরী হবে এবং শহরের অর্থনীতি দ্রুত প্রসার লাভ করবে। মূলত অবকাঠামো এবং পর্যাপ্ত বিনিয়োগ [illegible] সিলেটে শিল্প ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনিয়োগ হচ্ছে না।

[illegible] উন্নয়ন সম্ভাবনা

[illegible] পুঁজি সমাবেশ

[illegible] সিলেটীরা মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইটালী, কানাডা, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের [illegible]। বহির্গমনের এ ধারা শুরু হয়েছে ষাটের দশকে যা এখনো চলছে। যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী অভিবাসীদের [illegible] সিলেটী। এখানে প্রতি ১০ টি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের ৬ টির মালিকই সিলেটী বাংলাদেশী। বাংলাদেশীরা যুক্তরাজ্যে ৭ম [illegible] এবং লন্ডন শহরে তৃতীয়।

[illegible] বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার এবং এর সর্ববৃহৎ অংশ আসে প্রবাসীদের কাছ থেকে। বিশ্ব ব্যাংকের [illegible] রিপোর্ট ২০০৬ অনুযায়ী রেমিটেন্সের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে ৬ শতাংশ। বিশ্বে চলমান [illegible] বাংলাদেশে রেমিটেন্সের পরিমান বেড়েই চলেছে। সিলেট শহরের অর্থনীতি এবং ভৌত উন্নয়নে রেমিটেন্সের [illegible] সারণী-৪.১৫ এ দেখানো হয়েছে সিলেট সদর এবং পৌর এলাকায় প্রবাসীদের অর্থায়নে কি ভাবে বিভিন্ন [illegible]।

সারণি-৪.১৫: প্রবাসী সিলেটবাসির অর্থায়নে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

এলাকা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৫১-১০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০১-২০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২০০ লক্ষ টাকা এর উর্দ্ধে
পৌর এলাকায়	৪৩৪	২১৪	৭২	৪০	১০৮
সিলেট সদর	৫৫১	৩১৭	৮৩	৪০	১১১

উৎস: অর্থনৈতিক জরিপ, ২০০১ এবং ২০০৩, জেলা সিভিল, সিলেট, বিবিএস।

রেমিটেন্স অর্থ প্রাপকদের জীবনে কেমন প্রভাব ফেলছে তা নির্ভর করে কিভাবে উক্ত অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে লক্ষণী
পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে, ভোগ বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ, আবাসনের মান বৃদ্ধি, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি
শহরের ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামোর উপর চাপ বৃদ্ধি। সরকার রেমিটেন্সের অর্থ উৎপাদনমূখী কাজে
ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করলে অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ জন্য রেমিটেন্সের অ
শিল্পসহ অন্যান্য উৎপাদনমূখী খাতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ যাতে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

৪.১২.২ সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগ

প্রবাসীদের রেমিটেন্স ব্যবহার করে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় শ্রেণীর সম্মিলিত বিনিয়োগ প্রসার সিলেটের অর্থনীতির বিক
ঘটাতে পারে। এজন্য যথাযথ নীতি এবং তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অতীতের সরকারগুলো প্রবাসী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য য
কাজ করে নাই। ফলে রেমিটেন্সের একটি বিরাট অংশ ভোগ এবং অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় হয়েছে। এর ফলে দেশে মুদ্রা
উৎসাহিত হয়েছে। সরকারী যথেষ্ট উদ্যোগ না থাকায় উৎপাদনশীল বিনিয়োগে প্রবাসীদের আকৃষ্ট করা যায় নাই। কিছু কিছু প্রব
রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করছে। এ সমস্ত পুঁজি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং দেশে
অর্থনীতিতে তাদের অবদান আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সরকার সিলেটে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা (SEZ) গঠনের চে
করছে। এই কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। অবকাঠামো সুবিধা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর হলে প্রবাসীরা শিল্প স্থাপনে উৎসাহি
হবেন। এতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং সিলেট এতদ্ঞ্চলের অর্থনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করবে। প্রতিবে
দেশগুলোর মত এখানেও প্রবাসীদের বিবিধ খাতে বিনিয়োগে বিশেষ সুবিধা দেয়া যেতে পারে। গৃহায়ন খাতে সহজ শর্তে ঋণ সুবি
দিয়ে নির্মাণ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। সরকারী সুযোগ সুবিধা এবং প্রবাসী বিনিয়োগ এ
দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারলে সিলেট তথা সমগ্র দেশে বিনিয়োগ ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে যার ইতিবাচক প্রভাব সমগ্র দেশের অর্থনীতি
পড়বে।

৪.১২.৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগ প্রসার

পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশ হিসাবে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান প্রসার অতি জরুরী। এজন্য সরকারের পি আর এস পিতেও দা
বিমোচনের কৌশল হিসাবে কর্মসংস্থানের উপর জোর দেয়া হয়েছে। ব্যাপক হারে শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থানে
লক্ষ্য অর্জন সহজ হতে পারে। বাংলাদেশে বৃহৎ পুঁজির অভাব রয়েছে। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারী পুঁজির বিকাশ ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের ল
অর্জনে মনোযোগ দিতে হবে। সরকারী নীতিতে এর প্রতিফলন আছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগের বিকাশ ঘটানোর জন্য অবকাঠা
সুবিধা তৈরী করতে হবে। রপ্তানীমুখী শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। প্রবাসীরা যাতে দেশে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়
বিষয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরী করতে হবে।

৪.১২.৪ শিল্পায়নের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন

প্রবাসী সিলেটীরা দেশে বিনিয়োগ করতে যথেষ্ট আগ্রহী। কিন্তু পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও সুযোগ সুবিধার অভাবে তারা এখানে বিনিয়
করতে উৎসাহী হয় না। সিলেট অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন, শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে যথেষ্ট অব
রাখবে। বিশেষ অর্থনৈতিক জোন শিল্প স্থাপনে বিশেষ কিছু সুবিধা দেয় যা জোনের বাইরে স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলো পায় ন
বিশেষত ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্পগুলো বেশি পরিমাণে সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন, রপ্তানীমুখী শিল্পের জন্য কর মওকু
টেকনিশিয়ানের আয়কর মওকুফ, সস্তা প্লটের ভাড়া, সস্তা শ্রম, বিদেশী বিনিয়োগের ১০০ ভাগ লাভ নিজ দেশে নিয়ে যাওয়া। সি
অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন স্থাপনের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

[illegible] অন্যান্য জেলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো।
[illegible] ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো সিলেটের খুব কাছে ফলে, রপ্তানীর জন্য পণ্য উৎপাদন করলে পরিবহন ব্যয় কম হবে।
[illegible] সিলেটি প্রবাসীদের প্রচুর অব্যবহৃত রেমিটেন্স ব্যাংকে অলস পড়ে আছে যা এখানে বিনিয়োগ হতে পারে।
[illegible] প্রবাসী সিলেটবাসীরাও বিনিয়োগে উৎসাহী হবেন।
[illegible] সিলেট প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল যা শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের উৎকৃষ্ট উৎস হতে পারে।
[illegible] এখানে শিল্প স্থাপন করলে ভারত থেকে কাঁচামাল আমদানীও সহজ হবে ।
[illegible] সিলেটবাসীদের ক্রমবর্ধমান ক্রয় ক্ষমতাহেতু সিলেটে একটি বড় ভোগ্যপণ্যের বাজার তৈরী হতে পারে।
[illegible] মিলিয়ন জনসংখ্যা সমৃদ্ধ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এতদাঞ্চলের ভালো বাজার হতে পারে।

[illegible] পর্যটন খাতের উন্নয়ন

পর্যটন খাত সিলেটের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারে। সিলেট শহর ও তার আশেপাশের [illegible] পর্যটন সম্পদ নিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় বিবেচনা করে পর্যটন খাতের উন্নয়নের জন্য একটি [illegible] পর্যটন পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং এই অঞ্চলে দরিদ্র [illegible] সুযোগ তৈরী হবে।

[illegible] দেশের সাথে সিলেট শহরের সড়ক, অকাশ ও নৌপথের সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। হাওর-বাওর, টিলা-পাহার সমৃদ্ধ [illegible] প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এই এলাকা পর্যটক আকর্ষনের জন্য অন্যতম। সিলেট দেশের চা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। [illegible] ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের দিক দিয়াও এই শহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত শাহ জালাল (রহঃ) ও হযরত শাহ পরাণ [illegible] এর মাজার শরিফ থাকার কারণে শহরটি "পবিত্র নগরী" নামে পরিচিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার [illegible] এখানে সুফী সাধকদের মাজার জিয়ারত করতে ছুটে আসেন।

[illegible] স্থানীয় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি

[illegible] সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেই আর্থিক সমস্যা প্রকট। আয় যথেষ্ট না হওয়ায় তারা প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ [illegible] পারেনা। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য সিটি কর্পোরেশনকে উদ্ভাবনী কৌশল বের করতে হবে। কর ধার্য করে অনেক অনাকাঙ্খিত [illegible] করা যায়। শাস্তিমূলক কর ধার্য করে বেআইনী ভূমি ব্যবহার রোধ করা যেতে পারে। শহরের অভ্যন্তরে শিল্প স্থাপন [illegible] করার জন্য কর ধার্য করা যায়। সিটি কর্পোরেশনের সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা যায়। [illegible]-প্রাইভেট পার্টনারশীপ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে সম্পদের সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস করা যায়। হোল্ডিং কর যুক্তিযুক্ত [illegible] বৃদ্ধি করতে হবে। নূতন আয়ের উৎস উদ্ভাবিত হলে সিটি কর্পোরেশন আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হবে এবং সরকারের উপর [illegible] কমে আসবে। কিভাবে সিটি কর্পোরেশনকে আর্থিক দিক দিয়ে আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায় সেজন্য সরকারকে মনযোগী [illegible]। এজন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অবকাঠামো তৈরী করতে হবে। দক্ষতা ও অবকাঠামো সমৃদ্ধ না করে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রমাগত [illegible] সহায়তা দিলে স্থানীয় সরকার কখনো স্বয়ম্ভর হবেনা।

পঞ্চম অধ্যায়
স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা

৫.১ স্ট্রাকচার প্ল্যানের ধারণা

স্ট্রাকচার প্ল্যান একটি পরিকল্পনার রূপরেখা বা ধারণা যা মূল পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে প্রণয়ন করা হয়। এতে মূলত পরিকল্পনা [illegible] কিছু নীতি থাকে এবং ভৌত পরিকল্পনার কিছু প্রধান প্রধান অংশ রূপরেখা আকারে বিবৃত করা হয়। এই রূপরেখা এবং নীতিমালার আলোকে পরবর্তী স্তরের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। স্ট্রাকচার প্ল্যান দীর্ঘ মেয়াদের জন্য প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এটি বৃহত্তর এলাকা নিয়ে প্রণয়ন করা হয় যেখানে ভবিষ্যতে নগরায়ণ হতে পারে। সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য প্রণীত স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও মেয়াদকাল নিয়ে আলোচনা করা হলো:

৫.১.১ স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্যে

[illegible] স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ:

- শহর সম্প্রসারণের জন্য সম্ভব্য এলাকা নির্দিষ্ট করা;
- ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামোগুলো নির্দেশ করা;
- সিলেট শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের নীতিমালা নির্ধারণ করা।

৫.১.২ স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা

[illegible] রেফারেন্সে উল্লেখিত প্রকল্প এলাকার সীমানাই স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা। স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা ম্যাপ-৫.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৫.১: স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা

প্ল্যানের নাম	এলাকা	আয়তন		
		বর্গ কিঃ মিঃ	একর	হেক্টর
স্ট্রাকচার প্ল্যান	সমগ্র পরিকল্পনা এলাকা	৮৫.১৮৩	২১০৩৯.৭৩	৮৫১৮.৩২
[illegible] এরিয়া প্ল্যান	সিটি কর্পোরেশন এবং সংলগ্ন এলাকা	৪০.৯৬	১০১১৭.১২	৪০৯৬.০০

৫.১.৩ স্ট্রাকচার প্ল্যানের ধরণ ও প্রকৃতি

সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য প্রণীত স্ট্রাকচার প্ল্যানের মেয়াদ আগামী ২০ বৎসর (২০১০-২০৩০)। এটি মূলত একটি লিখিত দলিল [illegible] করার জন্য তথ্যসহ সারণি, ম্যাপ, গ্রাফ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি পরিকল্পনার একটি রূপরেখা যা বিস্তারিতভাবে [illegible] এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানে বর্ণনা করা হয়েছে। **স্ট্রাকচার প্ল্যান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য একটি ম্যাপ [illegible] করা হয়েছে (স্কেল-১:২৮,০০০) যা প্রতিবেদনের শেষে একটি ফোল্ডারে উপস্থাপন করা হয়েছে।**

স্ট্রাকচার প্ল্যানের ম্যাপে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো:

- [illegible] ভৌত অবকাঠামো
  - [illegible] প্রধান রাস্তা, রেল লাইন, ব্রিজ;
  - [illegible] প্রধান প্রধান স্থাপনা (চিহ্ন দিয়ে প্রদর্শিত);
  - [illegible] প্রধান নদী ও খাল;
  - [illegible] ও চা বাগান;
  - [illegible] এলাকা ও কৃষিভূমি;
  - [illegible] স্থাপনা (চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত);
  - [illegible] শহর এলাকা;

- বিশেষ নিরাপত্তা এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ কে পি আই।

- উন্নয়নমূলকসহ বিভিন্ন ধরনের প্রধান প্রধান প্রস্তাবনা
  - প্রস্তাবিত প্রধান প্রধান সড়ক;
  - সম্ভাব্য শহর সম্প্রসারণ এলাকা;
  - প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এলাকা;
  - সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ফেলার স্থান;
  - পানি শোধনাগার, বর্জ্য শোধনাগার;
  - প্রাকৃতিক ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক;
  - প্রধান প্রধান উন্মুক্তাঞ্চল;
  - স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোন;
  - সিটি কর্পোরেশনের সীমানা।

৫.১.৪ স্ট্রাকচার প্ল্যানের বিষয়বস্তু

স্ট্রাকচার প্ল্যানে যে সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, সেগুলো হলো:

- নগর এলাকা উন্নয়ন
- পরিবহন ও যোগাযোগ
- পয়:নিষ্কাশন ও ড্রেনেজ
- পানি সরবরাহ
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার
- আবাসন
- অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান
- পর্যটন ও বিনোদন
- পরিবেশ।

৫.১.৫ স্ট্রাকচার প্ল্যানের মেয়াদকাল এবং সংশোধন

স্ট্রাকচার প্ল্যানের মেয়াদ ২০ বৎসর অর্থাৎ ইহা ২০৩০ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পরবর্তী স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ [illegible] সাল থেকে শুরু করতে হবে। বর্তমান স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে এবং প্রতি পাঁচ [illegible] অন্তর প্রয়োজন অনুযায়ী এটি পরিমার্জন করতে হবে। এই পরিমার্জনের কাজ প্রতি চতুর্থ বৎসরে সম্পন্ন করতে হবে যাতে [illegible] বৎসরের শুরু থেকে তা বাস্তবায়ন করা যায়।

৫.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ ও বিস্তরণ

কোন পরিকল্পনা এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করতে গেলে বিশেষ কতগুলো উপাদান বিবেচনা করতে হয়। কোন এলাকার [illegible] জনসংখ্যা আয়তন কত হবে এবং কিভাবে জনসংখ্যা পরিবর্তিত হবে তা অতীত ধারা থেকে অনেকটা ধারণা করা যায়। [illegible] এলাকার ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের আদমশুমারী থেকে পাওয়া জনসংখ্যা তথ্য থেকে জনসংখ্যা পরিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়া [illegible] এর ভিত্তিতেই সিলেটের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করা হয়েছে।

Structure Plan Area with SPZ Boundary

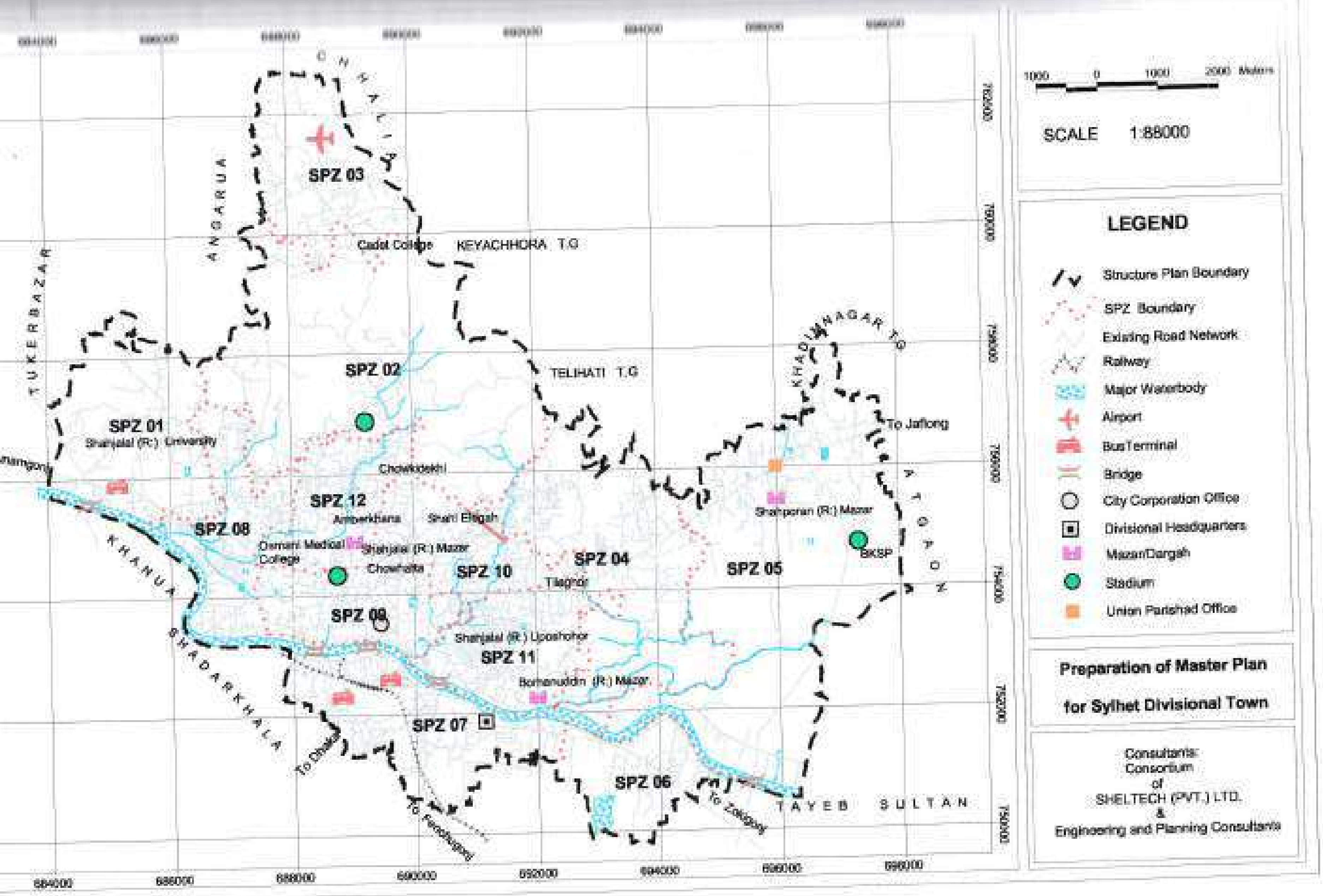

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির ধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে সিলেট শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে [illegible]। এ সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধির হার ধরে ২০০৬ সাল অভিক্ষেপ করা হয়েছে। [illegible] থেকে ৫ বৎসর অন্তর ২০৩০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করা হয়েছে ৪.৩৫% প্রবৃদ্ধির হার ধরে। অভিক্ষেপ অনুযায়ী সারণি-৫.২ তে দেখা যাচ্ছে ২০০৬ সালে জনসংখ্যা ছিল ৪.৮১ লক্ষ, যার মধ্যে ৪.৩৬ লক্ষ প্রস্তাবিত আরবান প্ল্যান এলাকায় এবং [illegible] লক্ষ সম্প্রসারিত এলাকায়।

সারণি- ৫.২: স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ

বৎসর	প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা (লাখে)	প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকার জনসংখ্যা (লাখে)	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা (লাখে)
২০০৬	৪.৩৬	০.৪৫	৪.৮১
২০১০	৬.০৬	০.৬৮	৬.৭৪
২০১৫	৮.৯০	০.৫২	৯.৪২
২০২০	১৩.১৩	০.৬৩	১৩.৭৬
২০২৫	১৯.৪০	০.৭৯	২০.১৯
২০৩০	২৮.৭৪	০.৯৭	২৯.৭১

সূত্র: ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের আদমশুমারীর তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরামর্শকগণ কর্তৃক অভিক্ষেপকৃত।

সারণি-৫.৩: জনসংখ্যা ঘনত্বের হিসাব

জনসংখ্যা ও জন ঘনত্ব									
২০১০		২০১৫		২০২০		২০২৫		২০৩০	
জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব
[illegible]	৬০	৮৬০৯৯৯	৮৮	৯৩১৩৪০৮	১৩০	১৯৪০৮৫৫	১৯২	২৮৭৪০৫৩	২৮৪

সূত্র: পরামর্শকগণ কর্তৃক হিসাবকৃত।

অভিক্ষেপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০৩০ সালের শেষের দিকে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা হবে ২৯.৭১ লক্ষ। এর মধ্যে আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় বসবাস করবে ২৮.৭৪ লক্ষ মানুষ এবং আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকার জনসংখ্যা হবে ০.৯৭ লক্ষ। এর অর্থ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার ৯৬% জনসংখ্যা প্রস্তাবিত শহর এলাকায় বসবাস করবে এবং মাত্র ৪% মানুষ নগর প্রান্ত এলাকায় বসবাস করবে। ২০২০ সালের মধ্যে শহর এলাকায় গ্রোস জনঘনত্ব হবে একর প্রতি ১৩০ জন এবং প্রান্ত এলাকায় একরপ্রতি মাত্র ৬ জন।

৫.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানের মধ্যে সম্পর্ক

মাস্টার প্ল্যান প্যাকেজে স্ট্রাকচার প্ল্যানের পরবর্তী স্তর হচ্ছে আরবান এরিয়া প্ল্যান। স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার মধ্যে যে সকল স্থান বর্তমানে নগর এলাকায় অবস্থিত এবং যে সকল স্থান শীঘ্রই নগরায়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা নগরায়নের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, সে সকল স্থান নিয়ে আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যত নগরায়নকে সুবিন্যস্তভাবে পরিচালিত করা এবং নগর এলাকায় পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতিমালা অনুসরণ করেই আরবান এরিয়া প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে।

সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে ১২ টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে যা ম্যাপ- ৫.১ এ দেখানো হয়েছে। [illegible] ১২ টি জোনের মধ্যে ৬ টি জোন প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ৬ টি জোন আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকায় অবস্থিত।

স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে নিম্নবর্ণিত কারণে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) বিভক্ত করা হয়েছে :

১। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান তৈরীর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা প্রয়োজন।
২। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্টপূর্ণ এলাকাগুলোকে SPZ এ ভাগ করে একক জো[illegible] আওতায় আনা।
৩। SPZ তৈরী করতে গিয়ে প্রসাশনিক সীমানাগুলিকে (ওয়ার্ড, মৌজা) যথাসম্ভব অটুট রাখা।

প্রতিটি SPZ নিয়ে এক একটি ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান একটি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক [illegible] নিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। সারণি-৫.৪ এ SPZ সমূহের এলাকা এবং বিভিন্ন বৎসরে জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে।

সারণি-৫.৪: স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনসমূহ (SPZ)

ক্রমিক নং	এসপিজেড (SPZ)	স্থানীয় সীমানা	পরিমাণ (একর)	জনসংখ্যা		
				২০১০	২০২০	২০৩[illegible]
সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরের SPZ						
১	এসপিজেড-০১	কুমারগাঁও (আংশিক) এবং কসবা আখালিয়া	১৬৯৩	১৩৬৪৭	২০০২০	[illegible]
২	এসপিজেড-০২	মঙ্গলীছড়া, মালনীছড়া, হামিদপুর, ব্রাহ্মণছড়া, তারাপুর এবং লাক্কাতুরা চা বাগান এলাকা	৩৬৭৬	৬৬২৪	১০১৫৮	[illegible]
৩	এসপিজেড-০৩	বারসালা	১৩২২	৭০৫৮	১০৩৫৪	[illegible]
৪	এসপিজেড-০৪	সাদিপুর (১ম অংশ) এবং দেবপুর (আংশিক)	২৩০৪	১৬২৪৬	২৩৮৩৩	[illegible]
৫	এসপিজেড-০৫	সুলতানপুর চক, খিদিরপুর, বহর, দেশ দেওয়ান এবং হাজিবাই	৪১৬৫	১৯৪৮৪	২৮৫৮৩	[illegible]
৬	এসপিজেড-০৬	কুচাই, পালপুর পূর্ব এবং পশ্চিম বাগ	৮২৮	৭৭১৬	১১৩১৯	[illegible]
সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার ভিতরের SPZ						
৭	এসপিজেড-০৭	ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭	১৬৮৫	২২৫৭৮	৪৬৬৬০	[illegible]
৮	এসপিজেড-০৮	ওয়ার্ড নং ৮, ৯ ও ১০	১১৪৫	৩৭১৬২	৭৬৮০০	[illegible]
৯	এসপিজেড-০৯	ওয়ার্ড নং ০২, ১১, ১২, ১৩, ১৪,১৫ ও ১৬	৯৪২	৭১০৮৬	১৪৬৯০৯	[illegible]
১০	এসপিজেড-১০	ওয়ার্ড নং ৫, ১৭, ১৮, ১৯, এবং ২০	৯৭৭	৫৫২৩১	১১৪১৪২	[illegible]
১১	এসপিজেড-১১	ওয়ার্ড নং ২১, ২২ ও ২৩ এবং ২৪	১০৯৮	২৯০৮২	৬০১০২	[illegible]
১২	এসপিজেড-১২	ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭	৯০৩	৪৭৭৬০	৯৮৭০২	[illegible]
মোট			২১০৩৯	৩৩৩৯৭৪	৬৪৭৫৮৩	[illegible]

সূত্র-বাংলাদেশ আদমশুমারী ১৯৯১ ও২০০১ এর উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে।

৫.৪ ভৌত উন্নয়নের কৌশল

৫.৪.১ বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণ

ক্রমাগত নগরায়নের চাপে দেশের মূল্যবান কৃষি ভূমি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য তাই আমা[illegible] এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কৃষি ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিদ্যমান নগর ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। ডি[illegible] এরিয়া প্ল্যান তৈরীর সময় তাই শহরের বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হবে। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্ব[illegible] হবে।

ক. নগর এলাকায় ঘনত্ব বৃদ্ধি

শহরের যে সমস্ত এলাকায় এখনো ঘনত্ব কম সে সমস্ত এলাকায় ঘনত্ব বৃদ্ধি করে অধিকসংখ্যক মানুষকে আবাসন প্রদান। [illegible] সমস্ত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

ঘ. নগর প্রান্ত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা

জমির মূল্য কম থাকায় মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তরা নগরপ্রান্ত এলাকায় আবাসন নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি ক্রয় করে থাকে। কিন্তু পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকায় তারা আবাসন নির্মাণ করতে পারে না। অবকাঠামো নির্মাণ করলে ঐ সমস্ত এলাকায় নগরায়ণ ত্বরান্বিত হবে এবং এতে মূল শহর এলাকায় ভূমির উপর চাপ কমবে। অবকাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাস্তা। মানসম্মত এবং পর্যাপ্ত প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে যান্ত্রিক যানবাহন সহজে চলাচল করতে পারে। এছাড়া পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ড্রেনেজের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫.৪.২ নতুন এলাকাকে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় আনা

ভবিষ্যৎ শহরকে পরিবেশ সম্মত ও বসবাস উপযোগী রাখার জন্য নতুন এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। এ জন্য ভবিষ্যৎ শহর এলাকার সমগ্র জমি হুকুম দখলের প্রয়োজন নেই। তবে উন্নয়ন হতে হবে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো এবং এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ জন্য প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিভিন্ন ধরনের এলাকা উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করা হবে। পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্য হবে:

- শহর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সমগ্র উন্নয়ন ব্যয় পুনরুদ্ধার করা।
- সরকারী নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে যৌথভাবে শহর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- সকল আয়ের মানুষের ভূমি প্রাপ্তি এবং ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে।
- উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পরিবর্তন করতে হবে। এতদিন এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরাসরি জনগণকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করতো এখন থেকে তাদের সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি সংস্থাসমূহ সেবা প্রদানকারীর ভূমিকা পালন করবে। সরকারী উদ্যোগে উন্নয়ন করতে প্রচুর সময় ক্ষেপন হয় এবং অব্যবস্থার কারণে প্রচুর অপচয় হয়। এ ছাড়া এতে বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বেশি সুবিধা ভোগ করে। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের ফলে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে উন্নয়ন সুবিধা সুষমভাবে পৌঁছানো সম্ভব হবে। পরিকল্পিত এবং সুষম নগরোন্নয়নের জন্য দুই ধরণের পদ্ধতি ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ক. অবকাঠামো ভিত্তিক নগরোন্নয়ন উদ্যোগ

অবকাঠামো ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে মৌলিক অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা প্রদান করে বিশেষ বিশেষ এলাকায় নগরায়ণ ত্বরান্বিত করা। অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার মধ্যে আছে, রাস্তা, পানি, বিদ্যুৎ, ড্রেনেজ ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা এ গুলো প্রদান করবে এবং এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বেসরকারী উদ্যোগে নির্মাণ ও স্থাপনা তৈরী হবে। তবে নতুনভাবে সরকারী-বেসরকারী বা সরকারী-কমিউনিটি উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এতে সরকারী ব্যয় হ্রাস পাবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হবে। ভূমি হুকুম দখল বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং ভূমির মালিকানা অক্ষুন্ন থাকবে। এজন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া কমিউনিটি ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ল্যান্ড রিএডজাস্টমেন্ট বা গাইডেড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। এ ধরনের প্রকল্প অংশগ্রহণ ভিত্তিক হওয়ায় দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারযোগ্য বলে নগরোন্নয়নে সরকারী ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাবে।

খ. সরকারী উদ্যোগে প্রচলিত নগরোন্নয়ন অব্যাহত রাখা

সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি প্রচলিত ভূমি হুকুমদখল ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমও চালু রাখতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা উন্নয়ন, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির উন্নয়ন, নিম্ন আয়ের বা দরিদ্র মানুষের আবাসন নির্মাণের জন্য এই উদ্যোগ চালু রাখতে হবে।

৫.৪.৩ এলাকা সংরক্ষণ ও সুরক্ষা

সিলেট শহর ও এর আশে পাশে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রাকৃতিক ও প্রাচীন স্থাপনা রয়েছে যেগুলো পরিবেশগত এবং ঐতিহ্যগত কা… সংরক্ষণ ও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

ক. উত্তরের পাহাড় শ্রেণী

শহরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সবুজ পাহাড় সিলেটের জন্য এক বিরল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। এছাড়া এখানে চা বাগান রয়ে… একদঞ্চলের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এই দুই মিলিয়ে সিলেট শহরকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। এছাড়া এই এলা… ইকোলজিক্যাল অবসাম্য রক্ষায়ও এই পাহাড় শ্রেণী বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তাই যে কোন মূল্যে এই প্রাকৃতিক মহিম… রাখতে হবে। পর্যটকদের জন্য এই এলাকা একটি বিশেষ আকর্ষণ।

খ. প্রধান প্রধান পুকুর ও লেক

ভূমির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় শহরের পুকুরগুলো দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার জন্য এ সমস্ত জলাশয় বি… গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ এবং জরুরী অবস্থায় এগুলো স্থানীয় পানির প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগে। অগ্নি নির্বাপণের সময় পুকুরের পা… কাজে লাগানো যেতে পারে। দৈনন্দিন কাজেও এই পানি ব্যবহার করা যায়। এতে সিটি কর্পোরেশনের সরবরাহকৃত পানির উ… চাপ হ্রাস পাবে। এছাড়া চিত্তবিনোদনের জন্য উন্মুক্তাঞ্চল হিসাবেও এগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

গ. প্রাচীন ঐতিহ্য

সিলেট যে সকল প্রাচীন ও ধর্মীয় ঐতিহ্যগত স্থাপনার জন্য বিখ্যাত সেগুলো সংরক্ষণ করা একটি জাতীয় দায়িত্ব। নিম্নে স্থাপনা… উল্লেখ করা হলো:

- হযরত শাহজালাল (রহ:), হযরত শাহ পরাণ (রহ:) ও অন্যান্য আউলিয়াদের মাজার।
- সুরমা নদীর শেখ ঘাট যেখানে হযরত শাহজালাল (রহ:) প্রথম অবতরণ করেছিলেন।
- সুরমা নদীর দক্ষিণে তের রতন এলাকায় হযরত বুরহানুদ্দিন (রহ:) এর মাজার।
- সিলেটের তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে দূর্গ সাদৃশ শাহী ঈদগাহ।
- মুসলিম সাহিত্য সংসদের অফিস।
- ধোপা দীঘির পাড়ে এম এ জি ওসমানীর বাড়ী এবং যাদুঘর।
- রাজা গৌরগবিন্দের প্রাসাদ।
- মনিপুরের রাজার রাজপ্রাসাদ।
- মুরারীচাঁদ কলেজ ভবন।
- সুরমা নদীর উপর কীন ব্রিজসহ আমজাদ ঘড়ির টাওয়ার ও সংলগ্ন এলাকা।
- শেখ ঘাটে অবস্থিত খান বাহাদুর আবু নাসের মো:ইয়াহিয়ার বাড়ী।
- ওসমানী বিমানবন্দর সংলগ্ন মালনীছড়া, তারাপুর, ব্রাহ্মণশাসন ও মঙ্গলীছড়া চা বাগান।

ঘ. সুরমা নদী

সুরমা নদী সিলেট শহরের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ যা এই শহরের উন্নয়ণে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এটি … যোগাযোগ, পানি সরবরাহের উৎস এবং ব্যস্ত শহরবাসীর চিত্তবিনোদনের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এই নদীটি শহর … সংলগ্ন এলাকার পানি নিস্কাশনেরও অন্যতম স্থান। তাই সিলেট শহরবাসীর বহুবিধ উপকারের জন্য এই নদীকে সংরক্ষণ করতে … এবং দূষণমুক্ত রাখতে হবে। এ জন্য এ নদীর পাড়ে শিল্প স্থাপন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৫.৫ স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা

আলোচ্য অংশে বিধৃত স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা আগামী ২০ বৎসর, অর্থাৎ ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য থাকবে। নীতিমালাগুলো মূলত শহরভিত্তিক প্রধান প্রধান সমস্যা ও ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। নীতিমালায় যে সমস্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো যাতায়াত, ড্রেনেজ, বর্জ্য নিষ্কাশন, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন, গৃহায়ন, বিনোদনমূলক উন্মুক্ত এলাকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নগর দারিদ্র।

৫.৫.১ নগরোন্নয়ন নীতিমালা

আলোচ্য নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান নগর সমস্যাগুলোর সমাধান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যার মোকাবেলার জন্য এখনই ব্যবস্থা নেয়া। বিদ্যমান প্রধান প্রধান সমস্যা/ইস্যুর মধ্যে রয়েছে নিচু অথচ মূল্যবান জমি সংরক্ষণ, অবকাঠামো নির্মাণে তহবিলের অভাব, সঠিক স্থানে উন্নয়ন না হওয়া এবং উন্নয়নে যথার্থ দিক নির্দেশনার অভাব ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়ন এবং নগর সমস্যা মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত নীতি সুপারিশ করা হয়েছে:

নীতি- ইউএ/১: নগর ভূমির সুবিন্যস্ত ব্যবহার

যৌক্তিকতা: বর্তমানে শহর এলাকার ভূমি বিশৃঙ্খলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মত নয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে শহর ক্রমশ বসবাস অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। সুষ্ঠু ও বসবাস উপযোগী শহর তৈরীর জন্য শহরের কর্মকাণ্ড সুবিন্যস্ত করতে হবে। এ জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : ইষ্ট বেঙ্গল বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন এ্যাক্ট ১৯৫২ এর আওতায় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

নীতি-ইউএ:/২ : বিদ্যমান অপরিকল্পিত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ।

অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বিদ্যমান শহর এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ করে জনঘনত্ব বৃদ্ধি করতে হবে।

যৌক্তিকতা: অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই।

বস্তবায়ন পদ্ধতি :

অবকাঠামো সংকট আছে এ ধরনের এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং এ জন্য বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিটিকে উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং উন্নয়ন ব্যয় ভাগাভাগি করে নেয়া যেতে পারে।

নীতি- ইউএ/৩: অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসার

নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলির অংশগ্রহণমূলক এবং যৌথ বা পার্টনারশীপ নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া উচিত। এ জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এ কাজে স্থানীয় কমিউনিটি ছাড়াও এনজিও এবং সিবিও সমূহকে যুক্ত করতে হবে। এ ভাবে সরকারী দায়িত্ব যৌথ দায়িত্বে পরিণত করতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহকে প্রথমে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: স্থানীয় কমিউনিটি, এনজিও এবং সিবিও সমূহকে যুক্ত করে নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করলে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতে ব্যয় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে, যে অর্থ পরবর্তীতে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও, সিবিও এনএইচএ।

বস্তবায়ন পদ্ধতি:

অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য এতদসংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়ো তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

নীতি- ইউএ/৪: নগর উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন

নগর উন্নয়নে সরকারী নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে সহায়কের ভূমিকা পালন করে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে এবং বেসর উদ্যোগে সব ধরনের নির্মাণের সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: এতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং বাণিজ্যিকভাবে বেসরকারী উদ্যোক্তরা রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত হ দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, আবাসন সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে এবং সিলেটে নগরায়ন ত্বরান্বিত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও, সিবিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

নীতি- ইউএ/৫: নগর প্রান্ত এলাকা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

অবকাঠামো নির্মাণ করে নগর প্রান্ত এলাকা উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: নগর প্রান্ত এলাকায় নতুনভাবে নগরায়ন হয়। সুতরাং এখানে পরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো নির্মাণ করে একদি পরিকল্পিত উন্নয়নের সুযোগ থাকে অন্যদিকে নগরায়ন দ্রুততর করা যায়। জমির মূল্য কম থাকায় অবকাঠামো নির্মাণ কম ব্যয় হয়। শহরের মূল এলাকার উপর জনসংখ্যার চাপ কমে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক নগর প্রান্ত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। কমিউনিটি অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করলে বাস্ত দ্রুততর হবে এবং নির্মাণ ব্যয় কম হবে। এ জন্য নগরপ্রান্ত এলাকায় জমির মালিকদের মধ্যে জনমত তৈরী করতে হবে। জন তৈরীর জন্য এনজিওদের সংশ্লিষ্ট করা যায়। কিছু পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রকৃত সমস্যা উদঘাটন করা প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এ জন্য অবকা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর উদ্যোগ প্রয়োজন।

নীতি- ইউএ/৬ : নগর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস জমির ব্যবহার

যৌক্তিকতা: খাস জমি জনগণের সম্পত্তি, সুতরাং তা জনগণের কল্যানে ব্যবহার করা উচিত হবে। নগরোন্নয়ন প্রকল্প বাস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের পূণর্বাসনে খাস জমি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা বা চিত্তবিনোদনের স্থান হি যথাসম্ভব খাস জমি ব্যবহার করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ভূমি মন্ত্রণালয়, ডিসি অফিস

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল খাস জমির তথ্য সংগ্রহ করা উচিত এবং সকল খাস জমি নিজের দখলে নেয়া উচিত এবং সেগুলি জনকল্যাণে ব্যবহার করা উচিত। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উচিত এ বিষয়ে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা।

৫.৫.২ পরিবহন ও যোগাযোগ নীতিমালা

নীতি-টিপি/১: বিদ্যমান সংকীর্ণ সড়ক প্রশস্তকরণ

যৌক্তিকতা: এতে কোন সন্দেহ নাই যে অদূর ভবিষ্যতে শহরে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শহরের সংকীর্ণ সড়কগুলো তখন সমস্যা হিসাবে দেখা দেবে। যানজট মানুষের জীবনযাত্রাকে স্থবির করে দেবে। এ জন্য এখনই পদক্ষেপ নিয়ে সরু রাস্তা প্রশস্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

শহরের বিদ্যমান সরু রাস্তার তালিকা তৈরী করতে হবে। সংলগ্ন জমির মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে রাস্তা চওড়া করার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে প্রয়োজন ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতি-টিপি/২: ২০ ফুট বা ৬.১০ মিটারের নিচে কোন নতুন রাস্তা নির্মাণ করা যাবে না। সিটি কর্পোরেশন ২০ ফুটের নিচে কোন রাস্তা নির্মাণ করবে না।

যৌক্তিকতা: সংকীর্ণ রাস্তা যানজটের কারণ। নতুন এলাকায় চওড়া রাস্তা তৈরীর সুযোগ থাকায় সে সুযোগ গ্রহণ করে রাস্তা চওড়া করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: নীতি বাস্তবায়নে জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করা যেতে পারে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠন করতে পারে। শহরপ্রান্ত এলাকায় নতুন রাস্তা তৈরীর সময় এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

নীতি-টিপি/৩: সড়ক সংযোগস্থল উন্নয়ন

যৌক্তিকতা: মেট্রোপলিটান শহর হিসাবে সিলেট দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এটি প্রায় ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার শহর হবে এবং যানবাহনের সংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পাবে। সড়ক সংযোগস্থল উন্নত হলে যানবাহন চলাচল সহজতর হবে এবং যানজট হ্রাস পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: আলোচ্য পরিকল্পনায় কিছু সড়ক সংযোগস্থলের নক্সা দেয়া হয়েছে যা সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তীতে নতুন রাস্তার ডিজাইন করার সময় সংযোগস্থলগুলোর ডিজাইন করতে হবে।

নীতি-টিসি/৪: পথচারীদের নিরাপদে রাস্তায় চলাচলের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি

যৌক্তিকতা: শহরে প্রতিদিন ৩২% যাতায়াত হয় পদব্রজে। এ জন্য শহরে ফুটপাথ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। [illegible] ফুটপাথগুলোকে সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রধান প্রধান সংযোগস্থলের আশে পাশের ফুটপাথগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে [illegible] ড্রেনগুলোকে কভার করে চলাচলের স্থান সম্প্রসারিত করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : অন্ততপক্ষে ৬ ফুট প্রশস্ত ফুটপাথ নির্মাণ করা উচিত। এ জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

নীতি-টিসি/৫: যে সমস্ত প্রধান রাস্তা বিদ্যমান ও সম্ভাব্য বাণিজ্যিক এলাকার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করবে সে গুলিতে সার্ভিস লেন থাকা বাঞ্ছনিয়

যৌক্তিকতা: সার্ভিস লেন থাকায় প্রধান সড়কে স্থানীয় যানবাহন এবং অযান্ত্রিক বাহন প্রবেশ করবে না। এতে প্রধান সড়কে [illegible] চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবেনা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সওজ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রাতিষ্ঠানিক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

নীতি-টিসি/৬: যে সমস্ত অপরিকল্পিত এলাকায় রাস্তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন আছে সেখানে সংযোগ সড়ক তৈরী করতে হবে

যৌক্তিকতা: প্রচলিত পদ্ধতিতে কমিউনিটি উদ্যোগে রাস্তা নির্মিত হয় অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খলভাবে। ফলে রাস্তা শুধু সংকীর্ণই [illegible] বিভিন্ন রাস্তার মধ্যে সংযোগও স্থাপিত হয় না। ফলে অনেক সময় কাছ কাছি স্থানে যেতে অনেক ঘুরতে হয়। ভবিষ্যতে [illegible] বৃদ্ধি পেলে এ সমস্ত রাস্তায় যানজট বাড়বে। এ জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে দুটি রাস্তার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে যাতায়াত সহজ করা [illegible]

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মিসিং লিংকগুলিকে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং লিংক রাস্তার ডিজাইন করে প্রকল্প [illegible] করতে হবে।

নীতি-টিসি/৭: ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগে যত্নবান হওয়া

যৌক্তিকতা: ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন সড়ক দুর্ঘটনা এবং যানজটের প্রধান কারণ। এ জন্য ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ [illegible] প্রয়োজন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : কঠোর ও নিরপেক্ষভাবে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ।

নীতি-টিসি/৮: রাস্তা নির্মাণে পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: রাস্তা নির্মাণের বিপুল ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেকসময় বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায় না। এ জন্য পর্যায়ক্রমে রাস্তা [illegible] করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীতে জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে রাস্তার জন্য জমি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে এতে সমন্বিতভাবে একটি [illegible] রোড নেটওয়ার্ক তৈরী করা সম্ভব হবে এবং সহজে যাতায়াতের বিকল্প রাস্তা পওয়া যাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সওজ, এলজিইডি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: প্রথমে রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। আঁকা বাকা রাস্তাগুলোকেও সরল করতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন সংস্থার যৌথভাবে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

<u>নীতি-টিপি/৯: নগরীতে অধিক সংখ্যক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট (বাস) চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক বাস সার্ভিসের প্রবর্তন যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ ও সাশ্রয়ী করবে এবং দু-স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন চলাচল হ্রাস করবে ফলে বায়ু দূষণ কমে আসবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, বেসরকারী বাস মালিক সমিতি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: জরিপ করে বাস রুট নির্ধারণ করতে হবে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। বেসরকারী বাস মালিক সমিতিকে যুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস বে ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করতে হবে।

[illegible] স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শহর সম্প্রসারণের কারণে স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠবে। সুতরাং এখন থেকেই উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতিমালা সুপারিশ করা হলো।

<u>নীতি-এসডি/১: ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক তৈরী করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: বর্তমানে বস্তি বা নিম্ন আয়ের এলাকা সমূহে মনুষ্য বর্জ ড্রেনে ফেলা হয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরুপ। সেপ্টিক ট্যাংক ভিত্তিক পয়ঃ ব্যবস্থা টেকসই সমাধান নয়। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ ব্যবস্থা হচ্ছে উন্নত্ব স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সরকারী প্রকল্প সহায়তায় অথবা বৈদেশিক সহায়তায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক তৈরী করতে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

<u>নীতি-এসডি/২: সমগ্র এলাকার জন্য স্তর বিশিষ্ট ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: ভবিষ্যৎ শহরকে জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখার জন্য কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। এ জন্য স্তর বিশিষ্ট ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে। এতে খুব সহজে বৃষ্টি এবং বর্জ্য পানি অপসারিত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঢাল অনুসরণ করে ড্রেন নির্মাণ করতে হবে। ছড়াগুলিকে প্রাইমারী ড্রেন হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

<u>নীতি-এসডি/৩: ছড়া নির্ভর প্রাকৃতিক পানি প্রবাহের চ্যানেলগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: ছড়াগুলো শহর এবং আশে পাশের পানি সংগ্রহ করে সুরমা নদীতে ফেলে দেয়। এই ছড়াগুলো বেদখল বা বন্ধ হয়ে গেলে শহরে জলাবদ্ধতা দেখা দেবে। সুতরাং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিসি অফিস, পরিবেশ অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ছড়া বা খাল গুলোর অবৈধ দখলকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে মূল জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে। ভরা... যাওয়া ছড়ার অংশ পুনর্খনন করে এগুলোকে সার্বক্ষণিক প্রবাহমান রাখতে হবে।

নীতি-এসডি/৪: সকল ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে এবং ছড়াগুলিকে পুনর্খনন করতে হবে।

যৌক্তিকতা: জন সচেতনতা না থাকায় প্রতিনিয়ত ড্রেনগুলিতে ময়লা ফেলা হয়। এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। এতে ... পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। যে ছড়াগুলো প্র... ড্রেন হিসাবে কাজ করছে সেগুলোকে পূর্ণখনন করে আরো কার্যকর করতে হবে যাতে বর্ষায় পর্যাপ্ত পানি ধারণ করতে পারে ... প্রবাহমান থাকে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ড্রেন পরিষ্কারে স্থানীয় কমিউনিটিকে যুক্ত করতে হবে। এতে ড্রেনে আবর্জনা না ফেলার বিষয়ে জনসচেতন... তৈরী হবে। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করে ছড়াগুলোর খনন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

নীতি-এসডি/৫: যত্রতত্র এবং ড্রেনে বর্জ্য ফেলার ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে।

যৌক্তিকতা: আবর্জনায় ড্রেন ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়া জলাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ। এ জন্য জনসচেতনতা তৈরী ক... হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে জনমত তৈরী করতে হবে এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ... এনজিও ও সিবিও সমূহের সহায়তা নিতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এবং এনজিও ও সিবিও এর সহায়তায় ... জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.৫.৪ পানি সরবরাহ

নীতি-ডব্লিউ এস:/১: উন্মুক্ত জলাশয় ভিত্তিক টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে।

যৌক্তিকতা: ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে পানির উপর চাপ বাড়ছে। যেহেতু ভূগর্ভস্থ পানিই প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার কর... তাই ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভের উপর চাপ পড়ছে। নিয়মিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে রিচার্য না হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ ... পাচ্ছে। সুতরাং ভূগর্ভস্থ পানির উপর ভিত্তি করে শহর এলাকায় কখনোই টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না ... জন্য উন্মুক্ত জলাশয় তথা, নদী ভিত্তিক পরিশোধনযোগ্য পানির উপর ভিত্তি করে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিপিএইচই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সুরমা নদীর উপযুক্ত স্থানে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরী করে নদীর পানি সরবরাহ করতে হবে।

নীতি-ডব্লিউ এস/২: উন্মুক্ত এবং ভূগর্ভস্থ জলাশয় দূষণ রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

যৌক্তিকতা: পানি দূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি স্বরূপ। এই দূষণ থেকে মহামারি পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং যে কোন উপা... পানিদূষণ প্রতিরোধ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিপিএইচই, সিবিও ডিওই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: এই নীতি বাস্তবায়িত হলে গৃহস্থালী মনুষ্য বর্জ্য ও বর্জ্য পানি এবং শিল্প বর্জ্য থেকে নদী দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এজন্য কঠোরভাবে নির্মাণ আইন প্রয়োগ করতে হবে ও জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে যাতে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলা না হয়। দূষণ প্রতিরোধ মনিটরিংএর জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

নীতি-ডব্লিউ এস/৩: জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য শহরের প্রধান প্রধান উন্মুক্ত জলাশয় সংরক্ষণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: শহর এলাকায় অগ্নিকান্ডের সময় এই জলাশয়গুলো পানির প্রয়োজন মেটাবে। এছাড়া এ গুলো উষ্ণতা প্রতিরোধ এবং উন্মুক্ত এলাকা হিসাবেও কাজ করবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস, ডিপিএইচই, ডিওই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অধীনে অবস্থিত বড় বড় পুকুর, লেক ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.৫.৫ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বর্জ্য বাড়তে থাকে। এক সময় এটা শহরের একটি বড় ধরনের সমস্যায় পরিণত হয়। এজন্য প্রথম থেকেই এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

নীতি-ডব্লিউ এম ১: কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

যৌক্তিকতা: যেহেতু আবাসিক এলাকায় কঠিন বর্জ্য মূলত গৃহস্থালী বর্জ্য, তাই কমিউনিটিকে এর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন। এতে বর্জ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা আরো সুষ্ঠু হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: এনজিও, সিবিওদের সংশ্লিষ্ট করে গৃহ থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে ট্রান্সফার ষ্টেশনে ফেলতে হবে। এ জন্য প্রতি গৃহ থেকে সার্ভিস চার্জ সংগ্রহ করতে হবে যাতে সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করা যায়।

নীতি-ডব্লিউ এম/ ২: স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে বর্জ্য ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাম্পিং সাইট তৈরী করতে হবে।

যৌক্তিকতা: বর্জ্য ফেলার জন্য পরিবেশ দূষণ করবেনা এমন দূরত্বে এক বা একাধিক ডাম্পিং সাইট থাকা প্রয়োজন। এখানে বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: পরিবেশ সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে ডাম্পিং সাইটে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে: ১। নিয়ন্ত্রিত ডাম্পিং পদ্ধতি, ২। স্যানিটারী ল্যান্ড ফিল, ৩। ইনসিনারেটর, ৪। কম্পোষ্টিং, এবং ৫। সম্পদ পুনরুদ্ধার।

নীতি-ডব্লিউ এম/ ৩: বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য নতুন ধারণা উদ্ভাবন করতে হবে।

যৌক্তিকতা: বর্জ্যকে উৎপাদনমূখী কাজে ব্যবহার করলে দরিদ্র মানুষ যারা বর্জ্য থেকে দ্রব্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে থাকে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া বর্জ্য পুণঃ ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং এর সুযোগ তৈরী হবে। এতে নতুন সম্পদ তৈরী হবে, বর্জ্য হ্রাস পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সরকারী পর্যায়ে বর্জ্য পুণ:ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং বিষয়ে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। পাইলট প্রকল্প সফল হলে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

৫.৫.৬ শিল্প ও বণিজ্যিক উন্নয়ন।

ভবিষ্যৎ সিলেট শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি প্রস্তাব করা হলো।

নীতি-আইসিডি/১: শিল্প-বাণিজ্য সহ সকল অর্থনৈতিক তৎপরতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যে কোন শহরের প্রাণশক্তি। সিলেটের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিওই, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে এবং সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সকল অপরাধমূলক আক্রমণ থেকে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যকে রক্ষা করতে হবে।

নীতি-আইসিডি/২: আর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিদ্যুৎকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: শিল্প বা বাণিজ্য বিকাশের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, আরইবি

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, সৌর বিদ্যুৎ প্রসার।

নীতি-আইসিডি/৩: প্রতিবন্ধকতা বিহীন পণ্য সরবারহ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। ব্যবসায়ীদের উপর সব ধরনের চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরী না করতে পারলে ব্যবসায়-বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে না। এতে শহরের সমৃদ্ধি ব্যাহত হবে, বিনিয়োগ হ্রাস পাবে, ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থান কমে যাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ বিভাগ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: শহরের অপরাধ পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ীদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতি-আইসিডি/ ৪: পরিবেশ দুষণ বন্ধ করার জন্য বিক্ষিপ্ত শিল্প কারখানা গড়ে ওঠা রোধ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানা অনেক সময় স্থানীয় পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এ অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করা অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিবেশ অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: যৌথ উদ্যোগে বিক্ষিপ্ত শিল্প স্থাপন বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা প্রয়োগ করে এ ধরণের শিল্প স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী শিল্প স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিতে হবে।

নীতি-আইসিডি/ ৫: বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপনে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ প্রসার ঘটাতে হবে।

যৌক্তিকতা: এ ধরনের শিল্প এলাকায় সব ধরণের অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধা থাকে বিধায় স্বল্প সময়ে শিল্প স্থাপন করে উৎপাদনে যাওয়া যায়। এ ছাড়া আমলাতান্ত্রিক ঝঞ্ঝাটমুক্ত থাকায় শিল্প উদ্যোক্তরা এখানে শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহী হয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বেপজা, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে সব ধরনের অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধাসহ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন করতে হবে। এ জন্য সরকারী পর্যায়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

নীতি-আইসিডি/ ৬: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তারা অবস্থাপন্ন না হওয়ায় তারা পুঁজির অভাবে শিল্প স্থাপন করতে পারে না। সহজ শর্তে পুঁজির ব্যবস্থা করতে পারলে এই খাতে প্রভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋন সংস্থা, এসএমই ফাউন্ডেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সরকারী পর্যায়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত ও জামানতবিহীন ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.৭ আবাসন

আবাসন হচ্ছে শহর এলাকার সর্ববৃহৎ ভূমি ব্যবহার। তাই উন্নয়ন বিষয়ক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানসম্মত আবাসন নগরবাসীকে স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের নিশ্চয়তা দেয় যা মানুষের উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

নীতি-এইচ এ/১: নতুন নগরায়নাধীন এলাকায় আবাসিক এলাকা নির্মাণের সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: শহর এলাকায় গৃহ নির্মাণের গতি শ্লথ হয় মূলত দুটি কারণে, জমির মালিকের আর্থিক সঙ্গতির অভাব এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহ নির্মাণ জরুরী, এজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরণের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, পিডিবি, ডিপিএইচই, এলজিইডি,বিটিসিএল।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: দ্রুত শহর সম্প্রসারিত হতে পারে এমন শহর প্রান্ত এলাকায় সব ধরনের পরিকল্পিত অবকাঠামো ও মৌলিক নগর সুবিধা প্রদান করে ঐ সমস্ত স্থানে আবাসন নির্মাণ উৎসাহিত করতে হবে।

নীতি- এইচ এ/২ : দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারী উদ্যোগে আবাসন নির্মাণ করতে হবে ।

যৌক্তিকতা: বাজার অর্থনীতিতে দ্রুত আর্থিক উন্নতি না হওয়ায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষরা অনেক সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এ জন্য সরকারী উদ্যোগে তাদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে, অন্যথায় সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, এনজিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ভূমি অধিগ্রহণ করে নিম্ন আয় সম্পন্ন মানুষের জন্য গৃহায়ন সুবিধা প্রদান করা যায়। তবে ভূমির স্বল্পতার [illegible] প্লটের চেয়ে ফ্ল্যাট প্রদান করাই শ্রেয়। এ জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

নীতি- এইচ এ/৩: বস্তিবাসির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে ।

যৌক্তিকতা: বস্তিতে বসবাসকারী দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষরা অনেক মৌলিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ [illegible] বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে সরকারী উদ্যোগে তাদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: বিদ্যমান বস্তিসমূহে পানি, বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা ড্রেন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এলাকা [illegible] মালিকদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি হতে হবে যে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী পাঁচ বৎসর গৃহের ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না।

নীতি- এইচ এ/৪: বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীদের অধিক আবাসন নির্মানে উৎসাহিত করতে হবে।

যৌক্তিকতা: সরকারের পক্ষে পর্যাপ্ত আবাসন প্রদান করা সম্ভব নয়। সুতরাং সিংহভাগ আবাসন যাতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের [illegible] থেকে আসে তার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: শহরের বর্ধিষ্ণু এলাকায় নগর সুবিধা বিশেষত রাস্তা নির্মাণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান করতে হবে। এতে [illegible] এস্টেট কোম্পানী সহজে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বিক্রয় করতে পারে।

৫.৫.৮ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান

নগরোন্নয়ন ও নগরের প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথোপযুক্ত নীতি স্থানীয় অর্থনী[illegible] উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

নীতি-ইকোন/১: বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরী

যৌক্তিকতা: এই নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে শহরে শিল্পে ও ব্যবসায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক বিকাশ ও কর্মসংস্থান [illegible] পাবে এবং পরিণতিতে আয় বৃদ্ধি হবে, চাহিদা ও সরবরাহ বাড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

বাস্তবায়ন সংস্থা: অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বেপজা, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা, অবকাঠামো নির্মাণ, বিশেষ শিল্প এলাকা স্থাপন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি বিনি[illegible] বান্ধব পরিবেশ তৈরী করতে পারে।

নীতি- ইকোন/২: সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন প্রসার ঘটাতে হবে।

যৌক্তিকতা: শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করে তা লাভজনক অবস্থায় বেসরকারী উদ্যো[illegible] কাছে বিক্রয় করা যেতে পারে। এতে শিল্প স্থাপন দ্রুততর হবে। কারণ ঝুঁকির ভয়ে অনেক সময় বেসরকারী উদ্যোক্তারা শিল্প স্থা[illegible] আগ্রহী হয় না। এ ছাড়া পুঁজি সংগ্রহ একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়।

[illegible] পদ্ধতি: নীতিমালা তৈরী করে সরকারী উদ্যোগে লাভজনক ও আমদানী বিকল্প শিল্প স্থাপন করতে হবে। এ জন্য বিশেষ [illegible] রাখা যেতে পারে।

[illegible]/২: বিদ্যমান শিল্প এলাকাসমূহ উন্নয়ন করে উহার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

[illegible]: শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প এলাকাগুলিতে শিল্প স্থাপন করার জন্য যাবতীয় সুযোগ [illegible] করতে হবে। এতে শিল্প এলাকার উপযুক্ত ব্যবহার হবে এবং যত্র তত্র শিল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশ বিনষ্ট হবে না।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়।

[illegible] পদ্ধতি: নির্দিষ্ট শিল্প এলাকায় শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা দিতে হবে। এ জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে [illegible]ভাবে পাইলট প্রকল্প নেয়া যেতে পারে।

[illegible]/৪: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

[illegible]: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সিলেট অঞ্চলের শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের [illegible] এই খাতে অপেক্ষাকৃত কম পূঁজি বিনিয়োগ করা হয় ও স্বল্প মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায়। সুতরাং এই খাতে বিনিয়োগে [illegible] করে সহজেই কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করা যায়। বর্তমানে অবস্থিত এ অঞ্চলের দেশজ শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত [illegible]।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনজিও, ।

[illegible] পদ্ধতি: জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করতে হবে। বেসিক সার্ভিস সহ ব্যবসা/শিল্প কারখানা করার উপযুক্ত স্থান দিতে [illegible] সকল বিষয়ে নমণীয় আচরণ করতে হবে।

[illegible]/৫: অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিকাশে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

[illegible]: অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড উন্নয়নশীল দেশের নগর অর্থনীতির আবশ্যকীয় অঙ্গ। বিপুল জনসংখ্যার দেশে [illegible] যখন যে কোন সরকারের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ তখন অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আত্মকর্ম সৃষ্টিতে অবদান রেখে [illegible] এগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ। দারিদ্র বিমোচন এবং নগর অর্থনীতির সমৃদ্ধির জন্য এ সমস্ত উদ্যোগ বিকশিত হওয়া [illegible]।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, এনজিও, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

[illegible] পদ্ধতি: জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করতে হবে। বেসিক সার্ভিস সহ ব্যবসা/শিল্প কারখানা করার উপযুক্ত স্থান দিতে [illegible] সর্ব বিষয়ে নমণীয় আচরণ করতে হবে।

[illegible] পর্যটন এবং বিনোদন

[illegible]/১: পর্যটন সুবিধার বিকাশ ঘটাতে হবে।

[illegible]: পর্যটন সুবিধা দেশী বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করবে এবং তারা এখানে অর্থ ব্যয় করবে। ফলে এখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি [illegible] এবং মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে। পর্যটকদের জন্য গড়ে ওঠা সুযোগ সুবিধা স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে সহায়তা করবে।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, সড়ক ও জনপথ, পর্যটন কর্পোরেশন, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: পর্যটন সহায়ক অবকাঠামো এবং সার্ভিস ব্যবস্থা নির্মাণ, চা বাগান দর্শনের জন্য সুযোগ তৈরী, রিসোর্ট
বেসরকারী উদ্যোক্তাদের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরী ।

নীতি-টিআর/২: শহর পর্যায়ে বিনোদন সুবিধার বিকাশ ঘটাতে হবে।

যৌক্তিকতা: মাঠ,পার্ক, শিশু পার্ক ইত্যাদি শহরে পর্যটক আকর্ষণ করে। এগুলো ব্যস্ত নগরবাসীর বিনোদনের অবলম্বন যা ব্যস্ত
জীবনের অত্যাবশকীয় অঙ্গ। এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে নগর জীবনকে আরো আকর্ষণীয় ও বসবাসযোগ্য করে গড়ে
হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পর্যটন কর্পোরেশন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসরকারী উদ্যোগ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: উপযুক্ত ভূমি হুকুম দখল করে মাঠ, পার্ক স্থাপন করতে হবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনোদনমূলক পার্ক
জন্য বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

নীতি-টিআর/৩: আঞ্চলিক ঐতিহ্য ভিত্তিক পর্যটন শিল্প বিকাশে ব্যবস্থা নিতে হবে।

যৌক্তিকতা: স্থানীয় ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য দর্শন পর্যটকদের বেশি আকর্ষণ করে। তাই স্থানীয় হস্ত শিল্প, সাংস্কৃতি, ঐতিহাসিক
প্রাকৃতিক স্থাপনাগুলোর প্রদর্শনের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পর্যটন কর্পোরেশন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এনজিও, বিসিক।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: স্থানীয় হস্ত শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে, নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে হবে, ঐতিহাসিক ও প্রা
স্থাপনাগুলোর রক্ষনাবেক্ষণ, সংরেক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.১০ পরিবেশ

অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন নগর পরিবেশ বিনষ্ট করার প্রধান কারণ। উপযুক্ত নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পরিবেশ দূষণ থেকে নগরকে
করতে পারে।

নীতি-ইএনভি/১: পাহাড় কাটা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: পরিবেশের ভারসাম্য, প্রাকৃতিক বৈচিত্র রক্ষা, ভূমি ধ্বস ইত্যাদি কারণে পাহাড় সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: প্রচলিত নির্মাণ আইন প্রয়োগ করে পাহাড় কাটা বন্ধ করতে হবে। বিষয়টি সিটি কর্পোরেশনের সার্ব
মনিটরিংএ রাখতে হবে।

নীতি-ইএনভি/ ২: ছড়া এবং নদী জবর দখল বন্ধ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: সাধারনত ছড়াগুলোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক পানি প্রবাহিত হয়। ছড়া সংকীর্ণ বা বন্ধ হয়ে গেলে জলাবদ্ধতা দেখা
নদীর তীর চিত্তবিনোদন স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে। খাল বা নদীর সীমানায় খুটি দিয়ে নির্দিষ্ট করতে হবে, নদী
পায়েচলা রাস্তা বা গাছ লাগানো যেতে পারে।

[illegible] ইএনভি/৩: নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করতে হবে।

[illegible]: সুরমা নদীর কিছু কিছু অংশে নদী ভাঙ্গন প্রবণতা আছে। এটা ঘটলে প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে এবং মানুষ গৃহহীন [illegible]। এ জন্য ভাঙ্গন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

[illegible]কারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি।

[illegible] পদ্ধতি: ঝুকিপূর্ণ এলাকায় নতুন গ্রোয়েন বানাতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। ব্যাংক ম্যাট্রেস [illegible] বিবেচনা করা যেতে পারে।

[illegible] ইএনভি/৪: বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত অঞ্চল / সবুজ এলাকা নির্মাণ প্রসার ঘটাতে হবে।

[illegible]: জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে শহর ঘিঞ্জি হয়ে পড়ে, নি:শ্বাস গ্রহণ করার মত স্থান ও পাওয়া যায় না। তাই এখন থেকে উন্মুক্ত [illegible] বিনোদন এলাকা ধরে রাখতে হবে। কারণ ভবিষ্যতে এ ধরণের সুযোগ সুবিধার জন্য স্থান পাওয়া যাবে না।

[illegible]কারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ।

[illegible] পদ্ধতি: শহরের ভেতরে অথবা বাইরে উপযুক্ত খালি স্থান /মাঠ/শিশু পার্ক লেক ইত্যাদির জন্য জমি হুকুম দখল করতে [illegible] এ জন্য সরকারকে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গীকার হিসাবে এ ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

[illegible] ইএনভি/৫: সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম প্রসার ঘটাতে হবে।

[illegible]: বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরীর জন্য সামাজিক বনায়নসহ সকল বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীকে উৎসাহিত করতে হবে।

[illegible]কারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, বন বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তর।

[illegible] পদ্ধতি: অংশগ্রহণমূলক এবং সুবিধা ভাগাভাগি জাতীয় সামাজিক বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। নার্সারী স্থাপনে [illegible] করতে হবে। বৃক্ষ নিধন প্রতিরোধ করতে হবে।

[illegible] নীতি বাস্তবায়ন

[illegible] নীতির সুপারিশ বাস্তবায়ন অনেকাংশেই রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এর সঙ্গে অনেক সরকারী এবং বেসরকারী [illegible] স্টেকহোল্ডার জড়িত থাকবে। নীতি বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের অঙ্গীকার থাকতে হবে এবং যথেষ্ট উদ্যোগী হতে [illegible] প্রকৃত অর্থে সিলেটের স্থানীয় অর্থনীতিকে উজ্জীবনের জন্য সকল দলের ঐক্যমত থাকতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

৬.১ সূচনা

আরবান এরিয়া প্ল্যান আলোচ্য প্ল্যান প্যাকেজের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা। এটি স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতিমালার আওতায় প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, আগামী ১০ বৎসরে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার অধীনে যে সমস্ত এলাকা নগরায়িত হবে সে সমস্ত এলাকার জন্য উন্নয়ন প্রস্তাব প্রদান করা। আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও নিকটবর্তী কসবা আখালিয়া মৌজা, কুমারগাঁও মৌজা (অংশ), সাদিপুর প্রথম অংশ, দেবপুর মৌজা (অংশ) এবং বহর মৌজা (অংশ) অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

৬.২ আরবান এরিয়া প্ল্যানের বিষয়বস্তু

আরবান এরিয়া প্ল্যান বিদ্যমান শহর এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নে দিক নির্দেশনা দেবে ও নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করবে। আরবান এরিয়া প্ল্যান মৌজা ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌজা ম্যাপের উপর প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাও রয়েছে ।

৬.২.১ আরবান এরিয়া প্ল্যানের উদ্দেশ্য

- বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শহরের ভূমি ব্যবহারসহ কার্যকর কাঠামো নির্দিষ্টকরণ।
- সিলেট শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রস্তাব প্রদান করা।

এ সকল উদ্দেশ্য নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করা যেতে পারে,

- যথাযথ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করে;
- সুবিন্যস্ত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করে;
- পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ ও সার্ভিস সুবিধাদি প্রদান করে।

৬.২.২ আরবান এরিয়া প্ল্যান ও স্ট্রাকচার প্ল্যানের মধ্যে সম্পর্ক

আরবান এরিয়া প্ল্যান স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতিমালার আওতায় প্রণয়ন করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যানের সম্পর্ক [illegible]পরম্পরা। এর বাস্তবায়নকাল স্ট্রাকচার প্ল্যান এর ২০ বৎসর মেয়াদের প্রথম ১০ বৎসর। আরবান এরিয়া প্ল্যানের লক্ষ্য স্ট্রাকচার প্ল্যানের লক্ষ্যের পরিপূরক। মূলত আরবান এরিয়া প্ল্যান হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও কৌশলের বিস্তারিত রূপরেখা।

৬.২.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান এর মেয়াদ ও সংশোধন

আরবান এরিয়া প্ল্যান ১০ বৎসরের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান আরবান এরিয়া প্ল্যান ২০২০ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর মেয়াদ সমাপ্তির পর নতুন একটি সংশোধিত আরবান এরিয়া প্রণয়ন করা হবে। এই নতুন আরবান এরিয়া প্ল্যান স্ট্রাকচার প্ল্যানের পরবর্তী সময়ের জন্য (২০৩০) বলবৎ থাকবে। তবে জনস্বার্থে সিটি কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আরবান এরিয়া প্ল্যান যে কোন সময় সংশোধন করা যাবে।

৬.২.৪ আরবান এরিয়া প্ল্যানের ধরণ ও পরিধি

আরবান এরিয়া প্ল্যান, ম্যাপ ও প্রতিবেদন উভয় আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্ল্যান ম্যাপ ১:৩৫,০০০ স্কেলে মৌজা ম্যাপের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্ল্যান এর সঙ্গে এর ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন আছে। এতে প্ল্যান সম্পর্কিত তথ্য এবং ম্যাপ সংযুক্ত আছে। এই প্ল্যান প্রতিবেদনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাব এবং প্ল্যান সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সিলেট মূল শহর এবং এর আশে পাশের ১০১০৯০.২০ একর বা ৪০.৯৬ ব: কি: এলাকা নিয়ে এই প্ল্যানের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। আরবান এরিয়া প্ল্যান ম্যাপ এই প্রতিবেদনের শেষে একটি ফোল্ডারে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৬.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান উপস্থাপনা

আরবান এরিয়া প্ল্যানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিলেট শহরের সার্বিক ভৌত উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করা। স্ট্রাকচার প্ল্যানে নি[illegible] নীতিমালার আলোকে এই দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে । বাংলাদেশে প্রচলিত মাস্টার প্ল্যানের আদলে আরবান এরিয়া [illegible] প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে প্রতিটি ভূমিখন্ডের ভবিষ্যৎ ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো প্র[illegible] হয়েছে। এটি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবেও কাজ করবে। তাই এটি স্ট্রাকচার প্ল্যানের তুলনায় অনে[illegible] অনমনীয়। এটি মৌজা ম্যাপের উপর উপস্থাপিত হয়েছে এবং সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের পর এটি আনুষ্ঠানিক ম[illegible] করেছে যা সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়।

৬.৩.১ আরবান এরিয়া প্ল্যানের বিভাজন

আরবান এরিয়া প্ল্যানের পরিধি ৪০.৯৬ ব: কি:। এতে সিলেটের মূল শহর এলাকা ছাড়াও সংলগ্ন সম্প্রসারিত এলাকা অ[illegible] রয়েছে। বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ নগর এলাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে টেকসই ও বাসযোগ্য নগরায়নই হচ্ছে [illegible] এরিয়া প্ল্যানের লক্ষ্য। সিলেট সিটি কর্পোরেশন আরবান এরিয়া প্ল্যানের অধিকাংশ এলাকায় প্রয়োজনীয় সেবাসুবিধা প্রদান [illegible] এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সম্প্রসারিত এলাকায় সেবাসুবিধা প্রদান করবে।

সারণি-৬.১ : আরবান এরিয়া প্ল্যানের পরিধি

এলাকা	আয়তন		
	ব: কি:	একর	হেক্টর
আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকা	৪০.৯৬	১০১০৯.০২	৪০৯৬.৭২
স্ট্রাকচার প্ল্যানের শতকরা অংশ	৪৮.০৫%		

স্ট্রাকচার প্ল্যানের সমগ্র এলাকাকে ইতিমধ্যে ১২ টি এসপিজেড (SPZ) এ ভাগ করা হয়েছে। তার ৬ টি SPZ আরবান এরিয়া[illegible] এলাকার ভেতরে অবস্থিত। **সারণি-৬.২** এ আরবান এরিয়া প্ল্যানের আওতাধীন SPZ সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং ম্যাপ-[illegible] আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার সীমানা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৬.২: আরবান এরিয়া প্ল্যানের আওতাধীন SPZ সমূহ

এসপিজেড (SPZ)	ভূমির পরিমাণ (একর)	স্থানীয় এলাকা	জনসংখ্যা (২০০১)	অভিক্ষেপকৃত জনসং[illegible]	
				২০১৫	২০[illegible]
এসপিজেড -০৭	১৬৮৫	ওয়ার্ড নং- ২৫, ২৬ এবং ২৭	২২৫৭৮	৬৯৮৩৯	[illegible]
এসপিজেড -০৮	১১৪৫	ওয়ার্ড নং-০৮, ০৯ এবং ১০	৩৭১৬২	১১৪৯৫০	[illegible]
এসপিজেড -০৯	৯৪২	ওয়ার্ড নং-০২, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬	৭১০৮৬	২১৯৮৮৪	[illegible]
এসপিজেড -১০	৯৭৭	ওয়ার্ড নং- ০৫, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০	৫৫২৩১	১৭০৮৪১	[illegible]
এসপিজেড -১১	১০৯৮	ওয়ার্ড নং-২১, ২২, ২৩ এবং ২৪	২৯০৮২	৮৯৯৫৭	[illegible]
এসপিজেড -১২	৯০৩	ওয়ার্ড নং-০১, ০৩, ০৪, ০৬ এবং ০৭	৪৭৭৬০	১৪৭৭৩২	[illegible]
কসবা আখালিয়া	২৮৭		৩৬১৪	৮১১৬	[illegible]
সদিপুর ১ম	৭৮০		৩০৭৩	৬৯০১	[illegible]
কুমারগাঁও	৩২৭		৪৪৯০	১০০৮৩	[illegible]
দেবপুর	৯৬৯		১১৯৪২	২৬৬১৮	[illegible]
বাহার	৯৯৫		১১৫২৩	২৫৮৭৭	[illegible]
মোট	১০১০৯		২৯৭৫৪১	৮৯০৯৯৯	[illegible]

Urban Area Plan Boundary with respect to Project Area Boundary

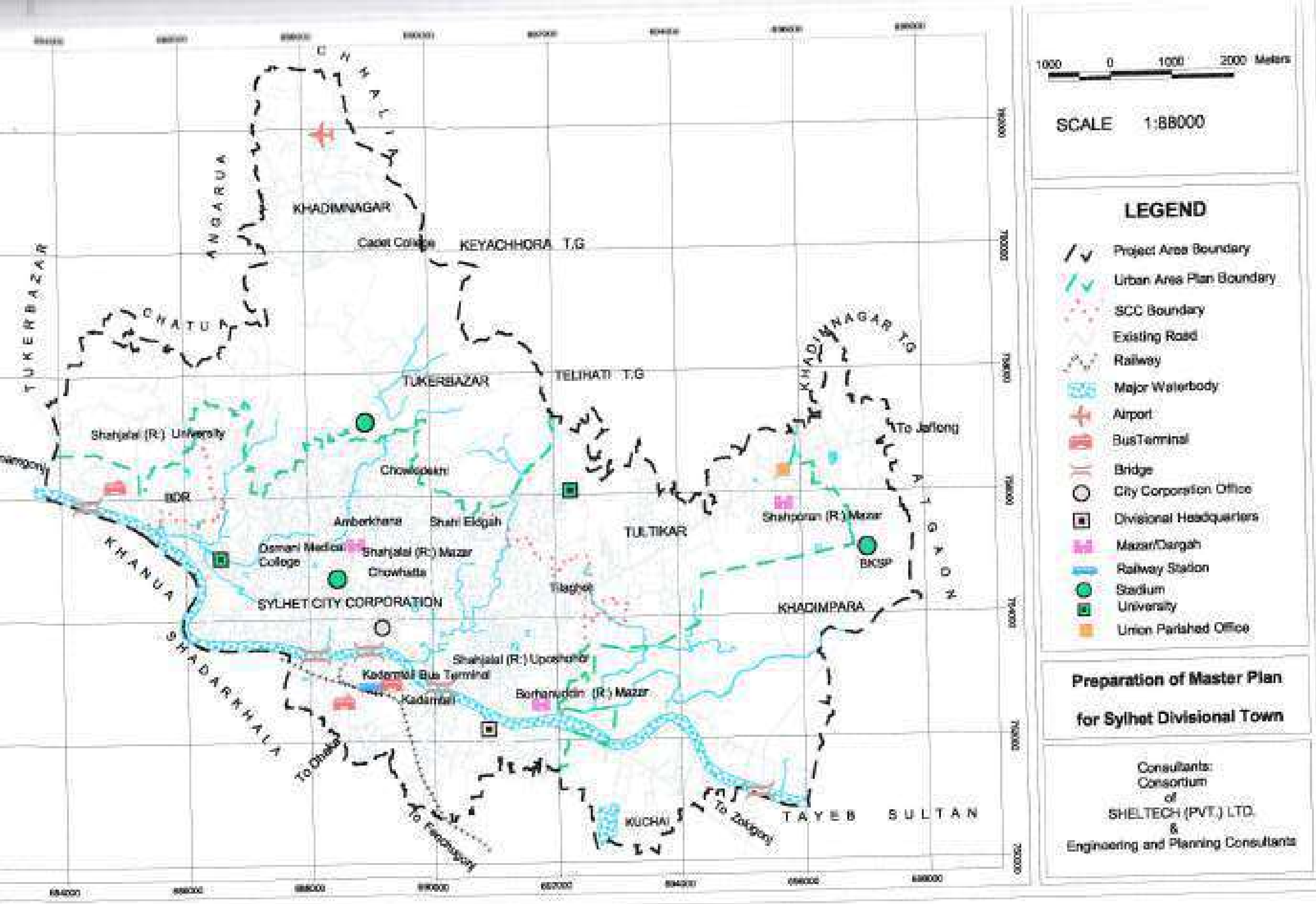

৬.৩.২ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও জনঘনত্ব

আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় বর্তমান জনসংখ্যার ঘনত্ব একর প্রতি ৫৫ জন, যা (সারণি-৬.২)। আরবান এরিয়া প্ল্যানের মেয়াদ শেষে, অর্থাৎ ২০২০ সালে জনসংখ্যা ঘনত্ব ১৩০ জনে দাঁড়াবে এবং তখন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮.৪%। ম্যাপ-৬.২ এ আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ পরিশিষ্ট-৬.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি- ৬.৩: আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব

	অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব					
	২০০৯		২০১৫		২০২০	
আয়তন (একর)	জনসংখ্যা	ঘনত্ব/ একর	জনসংখ্যা	ঘনত্ব/ একর	জনসংখ্যা	ঘনত্ব/ একর
১০১০৯	৫৬০১০৭	৫৫	৮৯০৯৯৯	৮৮	১৩১৩৪০৮	১৩০

সূত্র: পরামর্শকগণ কর্তৃক হিসাবকৃত।

৬.৩.৩ সুপারিশকৃত মানদণ্ড (Standard)

বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে ভূমি সীমিত কিন্তু জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ক্রমাগত নগরায়ণের ফলে রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল, কারখানা, বাজার ইত্যাদির জন্য ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে গিয়ে প্রচুর কৃষি ভূমি অকৃষিজ খাতে চলে যাচ্ছে। তাই কৃষিভূমি তথা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ভূমি সংরক্ষণ অতি জরুরী। এ জন্য জমিতে অকৃষিজ ব্যবহার সীমিত করতে হবে। এই ধারণাকে সামনে রেখে আলোচ্য পরিকল্পনার মানদণ্ড (Standard) প্রণয়ন করা হয়েছে। পরামর্শকগণ নিম্নবর্ণিত কিছু বিষয়ে পরিকল্পনার মানদণ্ড তৈরী করেছে:

১. রাস্তা।
২. আবাসিক এলাকা।
৩. সামাজিক সুবিধা সমূহ।
৪. কমিউনিটি সুবিধাদি এবং বিনোদন।
৫. ভৌত অবকাঠামো সুবিধা।

উপরে উল্লেখিত বিষয়ে পরিকল্পনার মানদণ্ড নিম্নে প্রদান করা হলো। বর্তমান পরিকল্পনায় এ সমস্ত মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন বা অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা তাদের পরিকল্পনায় এ গুলো ব্যবহার করতে পারে।

১. রাস্তা

ক. রাস্তার শ্রেণী বিভাগ বিষয়ক মানদণ্ড

<u>প্রধান রাস্তা</u>

নতুন রাস্তা : ROW ৩০.৪৫ মি: (১০০ ফুট) (ROW : Right of Way)

বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্তকরণ : ROW ১৮.৩০ মি: (৬০-৮০ ফুট)

<u>মাধ্যমিক রাস্তা</u>

নতুন রাস্তা : ROW ১২.২০ মি: (৪০ ফুট)

বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্তকরণ : ROW ৯.১৫ মি: (৩০ ফুট)

<u>সংযোগকারী রাস্তা</u>

নতুন রাস্তা : ROW ৯.১৫ মি: (৩০ ফুট)

বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্তকরণ : ROW ৬.০৯ মি: (২০ ফুট)

<u>প্রবেশ রাস্তা</u>

নতুন রাস্তা : ROW ৯.১৫ মি: (৩০ ফুট ন্যূনতম)

বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্তকরণ : ROW ৬.০৯ মি: (২০ ফুট ন্যূনতম)

খ. মহল্লা এবং স্থানীয় রাস্তা

সকল মহল্লা এবং স্থানীয় রাস্তা ২০ ফুট থেকে ৪০ ফুট প্রশস্ত হবে। কোন অবস্থাতে ২০ ফুটের কম কোন রাস্তা নির্মাণ করা যাবে

গ. রাস্তার মানসম্পন্ন ডিজাইন

রাস্তার উপরিভাগ যথেষ্ট টেকসই হওয়া উচিত। সংযোগস্থলগুলোর ডিজাইন এমন হওয়া উচিত যাতে যানবাহন খুব সহজেই চ করতে পারে। ব্রীজ এলাকায় রাস্তার ডিজাইন এমন হওয়া উচিত যাতে যানবাহনগুলো সাইট ডিসটেন্স পায় এবং মসৃণভাবে ব্রী আরোহন করতে পারে। বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-৬.২** এ দেয়া আছে।

ঘ. বিভিন্ন শ্রেণীর রাস্তার কার্যকারিতা

বিভিন্ন শ্রেণীর রাস্তার আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। প্রবেশ রাস্তার কাজ প্রতিটি বাড়ী/ইমারত/ভূমি ব্যবহার থেকে ট্রাফিক (এ ট্রাফিক বলতে পদব্রজে চলাচলকারীদেরও বোঝানো হয়েছে) সংগ্রহ করে সংগ্রহকারী রাস্তায় পৌঁছে দেয়া। আর মাধ্যমিক শ্রেণীর র কাজ ট্রাফিককে প্রধান রাস্তায় পৌঁছে দেয়া। তবে যভাবে রাস্তার শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে বাস্তবে শহর গড়ে ওঠার সময় সেভাবে তৈরী হয় না। এক মাত্র পরিপূর্ণ পরিকল্পিত শহরেই এটা সম্ভব। তবে অধিকাংশে ক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্ততার চেয়ে র অবস্থান কোথায়, রাস্তার পাশে কি ধরনের ভূমি ব্যবহার রয়েছে তার উপর নির্ভর করে রাস্তার কাজ করা হয়।

২। আবাসন

ক. ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ

আবাসন ঘনত্ব অর্থ জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ এবং এই ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের পরিবেশগত, সামাজিক ও ভৌত ইতিবাচক প্রভাব র অবকাঠামো কতটা টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে তাও অনেকটা নির্ভর করে জনঘনত্বের উপর। যথাযথ জনঘনত্ব বজায় র অবকাঠামোর ব্যবহারও যথাযথভাবে করা সম্ভব। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর আবাসিক এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব মানদন্ড প্রস্তা হলো।

খ. সরকারী উদ্যোগে নির্মিত আবাসিক এলাকা

সিলেটে সিটি কর্পোরেশন বা NHA এর উদ্যোগে সার্বজনীন আবাসন প্রকল্প (প্লট) বাস্তবায়িত হতে পারে। তবে, সেখানে নি বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে।

- প্রতি তিনকাঠা প্লটে গড়ে দুটি ইউনিট;
- প্রতিটি ভবন গড়ে তিন তলা;
- প্রতি ৩ কাঠা প্লটে ৬ টি পরিবার বসবাস করে;
- নেট ঘনত্ব হবে একরপ্রতি (১৫/৩ x ৬০) ৩০০ জন;

এখন নিম্নবর্ণিত উপায়ে গ্রোস ঘনত্ব হিসাব করা যেতে পারে:

- গড়ে একটি ১০০ একরের সবকটি আবাসিক এলাকার নেট আবাসিক এলাকার আয়তন ৬০ একর
- আবাসিক এলাকার মোট জনসংখ্যা: ৬০ X ৩০০ = ১৮,০০০ হলে
- আবাসিক এলাকার গ্রোস ঘনত্ব হবে: (১৮,০০০ ÷ ১০০): ১৮০ জন একরপ্রতি।

  সুতরাং,

  একরপ্রতি নেট ঘনত্ব হবে: ৩০০ জন

  একরপ্রতি গ্রোস ঘনত্ব হবে: ১৮০ জন

- এই ঘনত্ব মানদন্ড বাস্তবায়ন করতে হলে ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন (সেকশন-১৮) সংশোধন করতে হবে।

Phasing of Urban Growth in the Project Area

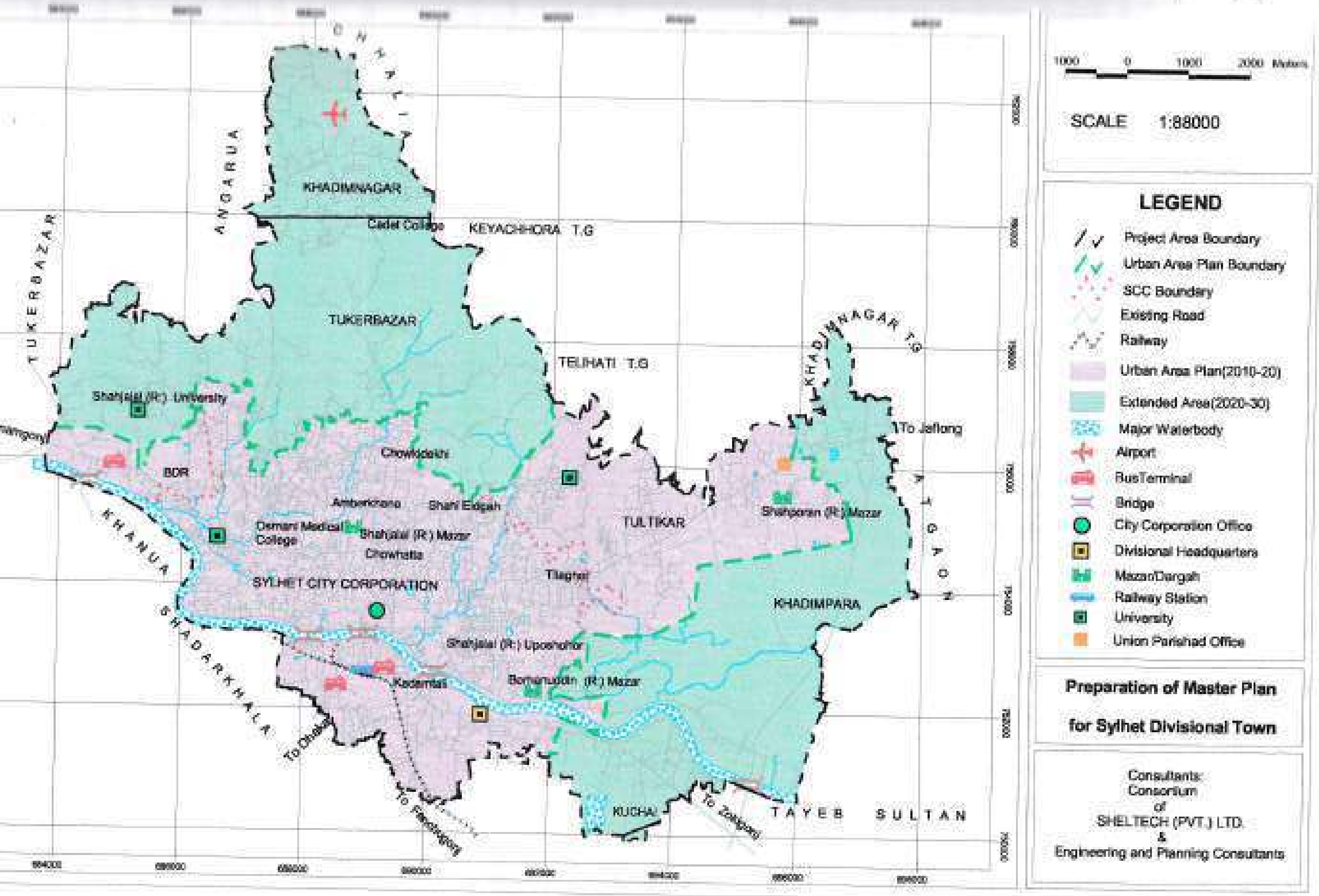

সরকারী উদ্যোগে নির্মিত আবাসিক এলাকা -বাণিজ্যিক ও সমবায়

উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করায় সরকারী আবাসন প্রকল্প সমূহের জন্য প্রণীত মানদন্ড বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত রিয়েল এস্টেট নির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন হবে। বাণিজ্যিকভাবে এবং সমবায় আবাসন প্রকল্প সমূহের জন্য তাই পৃথক মানদন্ড প্রয়োজন। এলাকায় **বাণিজ্যিক ও সমবায় আবাসন প্রকল্প সমূহের জন্য** একটি মানদন্ড অনুসরণ করা হয় যা এখানে প্রয়োগ করা যেতে এই মানদন্ড অনুযায়ী রাস্তাসহ বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসের জন্য ৩৫% জমি সংরক্ষিত রাখতে হবে। কোন অবস্থাতে এই জমি যাগ্য হবে না। এই মানদন্ড অনুসরণ করলে নিম্নবর্ণিত নেট এবং গ্রোস ঘনত্ব পাওয়া যাবে:

তি ৩ কাঠার প্লটে প্রতি ফ্লোরে গড়ে ২ টি ইউনিট;
তিটি ভবন ৩ তলা ;
তি ৩ কাঠার প্লটে (২ X ৩) ৬টি পরিবার বসবাস করবে;
তি ৩ কাঠার প্লটে জনসংখ্যা (পরিবারের গড় সাইজ ৫ জন ধরে): ৫ X ৩ = ১৫ জন;
করপ্রতি নেট আবাসিক ঘনত্ব: (১৫ ÷ ৩X ৬৫): ৩২৫ জন

তি:গ্রোস ঘনত্ব এভাবে হিসাব করা যায়:
০০ একরের একটি আবাসিক এলাকার নেট আয়তন ৬৫ একর
বাসিক এলাকার মোট জনসংখ্যা: ৬০ X ৩২৫= ২১১২৫ জন হলে
বাসিক এলাকার গ্রোস ঘনত্ব হবে: (২১১২৫ ÷ ১০০): ২১১ জন একরপ্রতি।

সুতরাং,

একরপ্রতি নেট ঘনত্ব হবে: ৩২৫ জন
একরপ্রতি গ্রোস ঘনত্ব হবে: ২১১ জন

নত্ব মানদন্ড বাস্তবায়ন করতে হলে ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন সংশোধন করতে হবে। উভয় শ্রেণীর পরিকল্পিত ক এলাকার উপরে উল্লেখিত ঘনত্বই চূড়ান্ত। ঘনত্ব বেশি ধরা হয়েছে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধা য়, যদিও তা প্রাথমিক ব্যয় বৃদ্ধি করবে।

াপনা আপনি গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকা

আপনি গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকাসমূহে ঘনত্ব মানদন্ড বাস্তবায়ন করা প্রায় একটি কঠিন কাজ। কারণ ঐ সমস্ত এলাকার মালিকানা ব্যক্তি পর্যায়ের এবং সামষ্টিকভাবে তাদের কোন সরকারী স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ (১৯৯৬ সালে সংশোধিত) ভবনের উচ্চতা নির্ধারক ধারাটি ঘনত্ব নির্দিষ্ট করণের আপতত একমাত্র উপায়।

হল্লার আয়তন

ী বা বেসরকারীভাবে যে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা নির্মাণ করা হয় তাকে নেবারহুড বা মহল্লা বলা যেতে পারে। এ সমস্ত ক এলাকার একটি নির্দিষ্ট আয়তন এবং একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা থাকে। এ ছাড়া কিছু কমিউনিটি সুযোগ সুবিধা প্রদান করা থাকে যা আপনা আপনি গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকায় থাকেনা। নিম্নবর্ণিত মানদন্ডগুলি তাই শুধুমাত্র সরকারী বা কারীভাবে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকাসমূহের জন্যই প্রয়োগযোগ্য হবে। একটি মহল্লার আয়তন কত হওয়া উচিত এ সম্পর্কে ী বা বেসরকারীভাবে নির্মিত আবাসিক এলাকার কোন মানদন্ড নেই। তবে এই আয়তন এত বড় হওয়া উচিত নয় যাতে অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ব্যাহত হতে পারে। অবকাঠামো ব্যয় এবং সামাজিক মেলা মেশার কথা বিবেচনা করে শ করা হচ্ছে যেন,

কারী বা বেসরকারীভাবে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা (প্লট) যেন সর্ব নিম্ন ৩ একর এবং সর্বোচ্চ ৫০-৬০ একরের মধ্যে াবদ্ধ রাখা হয়।

সাবে সর্বোচ্চ আয়তনের একটি সরকারী আবাসন প্রকল্পের জনসংখ্যা হবে ১০ হাজার, অর্থাৎ একরপ্রতি গ্রোস জনঘনত্ব ২০০ বেসরকারী আবাসন প্রকল্পে এই জনসংখ্যা হবে ১১,০৫০ জন এবং একরপ্রতি গ্রোস জনঘনত্ব হবে ২২১ জন।

চ. কমিউনিটি সুবিধাদি এবং বিনোদন

মহল্লা সেন্টার

প্রতিটি এসপিজেড এ একটি মহল্লা সেন্টার নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি মহল্লা সেন্টারে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা থাকবে

হলো,

- কমিউনিটি সেন্টার,
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র/ টিকাদান কেন্দ্র,
- ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস,
- ওয়ার্ড ভিত্তিক পৌর সুবিধাদি।

প্রতি মহল্লা সেন্টারের জন্য স্থান প্রয়োজন হবে ০.৩০ একর। বহুতল বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করে এ সমস্ত সুবিধাদি প্রদান ক
হবে।

৬.৪ আরবান এরিয়া প্ল্যানের উন্নয়ন প্রস্তাবনা

৬.৪.১ আবাসন এলাকা উন্নয়ন

ক. আবাসন এলাকা উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা

সিলেটের বর্তমান নগরায়ন ধারা এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা দেখে মনে হয় যে এখানে বড় ধরনের আবাসন নির্মাণের সুযোগ র
প্রচুর রেমিটেন্স আমদানী এবং দ্রুত বর্ধিষ্ণু হওয়ায় সিলেটের জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । এখানে সাইট এ্যান্ড সার্ভিস প্রকল্প
সহজতর হবে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এখানে একটি বড় ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। এ সুযোগ বেসরকারী আ
ব্যবসায়ীরাও নিতে পারে। তবে প্রকৃত অর্থে আবাসন সমস্যা সমাধান লক্ষ্য হলে সবচেয়ে ভালো হবে যদি সরকারী প্রতিষ্ঠান
সরাসরি আবাসন প্রদান না করে অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করে সাধারণ মানুষ এবং বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীদের আ
নির্মানের জন্য সুযোগ তৈরী করে দেয়। এজন্য সম্ভাব্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করে অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ
যেতে পারে। সিটি কর্পোরেশন এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারে। এ জন্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের উপর জোর দিতে
জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষও এই নীতি গ্রহণ করে আবাসন সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী ক
সব ধরনের অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধাদি প্রদান করবে যাতে যে কেউ সহজেই আবাসন নির্মাণ করে বসবাস করতে
সরকার উপযুক্ত পদ্ধতি তৈরী করে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে উন্নয়ন ব্যয় আদায় করে নেবে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ
অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যাবে, যেমন,

প্রথমত, অবকাঠামো নির্মাণের জন্য (যেমন রাস্তা) ভুমি বিনামূল্যে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এ জন্য সরকারী ব্যয় প্রয়োজন হবেনা ফলে প্রচুর রাস্ট্রীয় অর্থ সাশ্রয় হবে যা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার
যাবে।

তৃতীয়ত, যেহেতু এ ধরনের প্রকল্পে ভুমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবেনা, তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক সময় বেঁচে যাবে এবং ক
কম হবে।

চতুর্থত, তৈরী অবকাঠামো পেলে বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীরা আবাসন নির্মাণে উৎসাহিত হবে, ফলে শহরে বিনিয়োগ
পাবে।

পঞ্চমত, অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরায়ন ত্বরান্বিত হবে।

বহু ধরণের অংশগ্রহণমূলক আবাসন নির্মাণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সিলেটের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নিয়ে আবাসন নি
অগ্রসর হলে দ্রুত আবাসন সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে। উদ্যোগী হয়ে পেশাদারদের মাধ্যমে নতুন অংশগ্রহণ